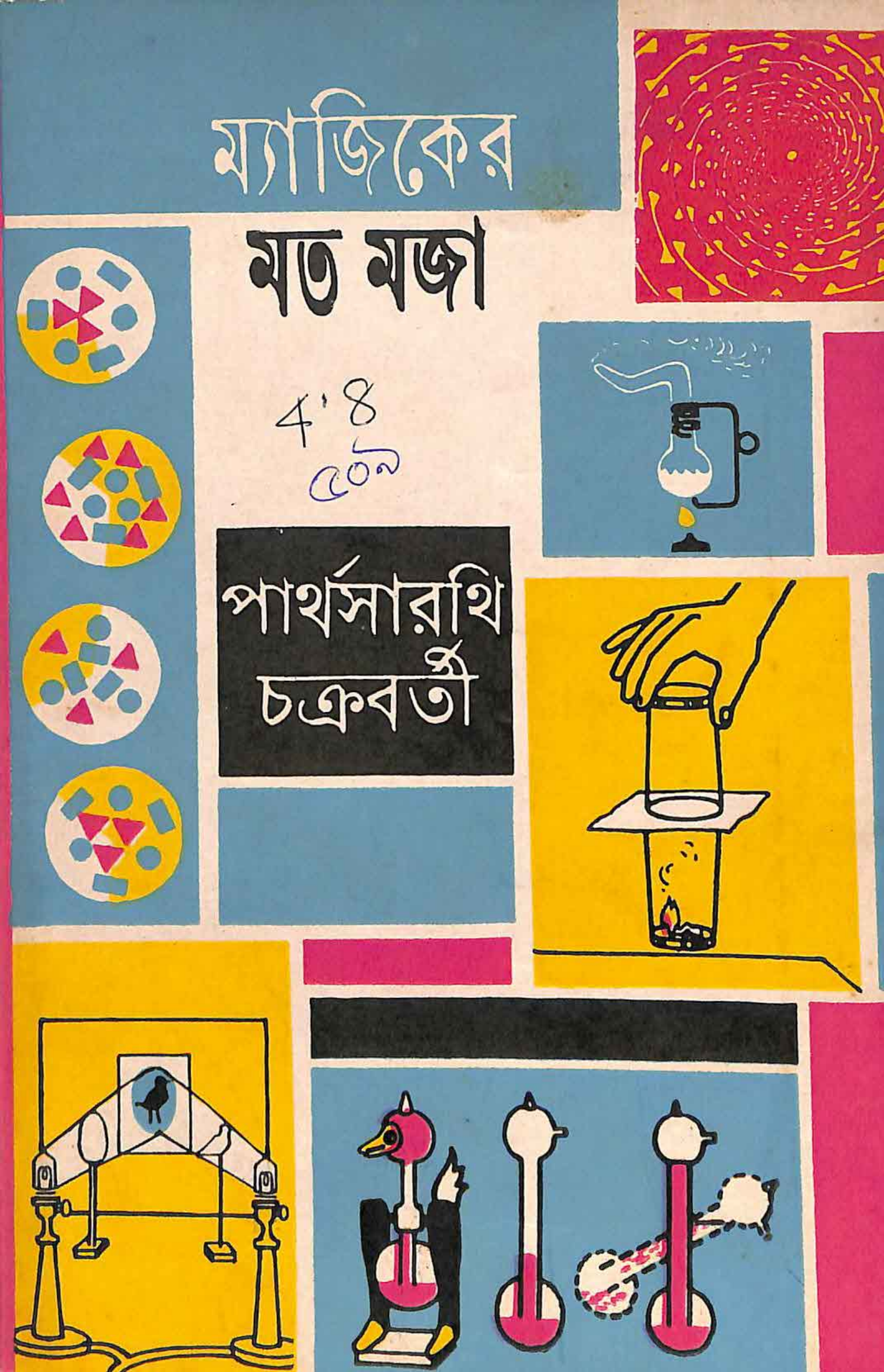
ম্যাজিকের মত মজা

পার্থসারথি চক্রবর্তী



ম্যাজিকের মত মজা

পার্থসারথি চক্রবর্তী

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৭৬ **পঞ্চম মুদ্রণ** নভেম্বর ১৯৮৩
ষষ্ঠ মুদ্রণ মে ১৯৮৬ মুদ্রণ সংখ্যা ৩৩০০

প্রচ্ছদ মদন সরকার

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম
নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৬·০০

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্, মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকর্তা শ্রদ্ধেয়
ডক্টর সমরেন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের করকমলে

গ্রন্থকার

সূচী

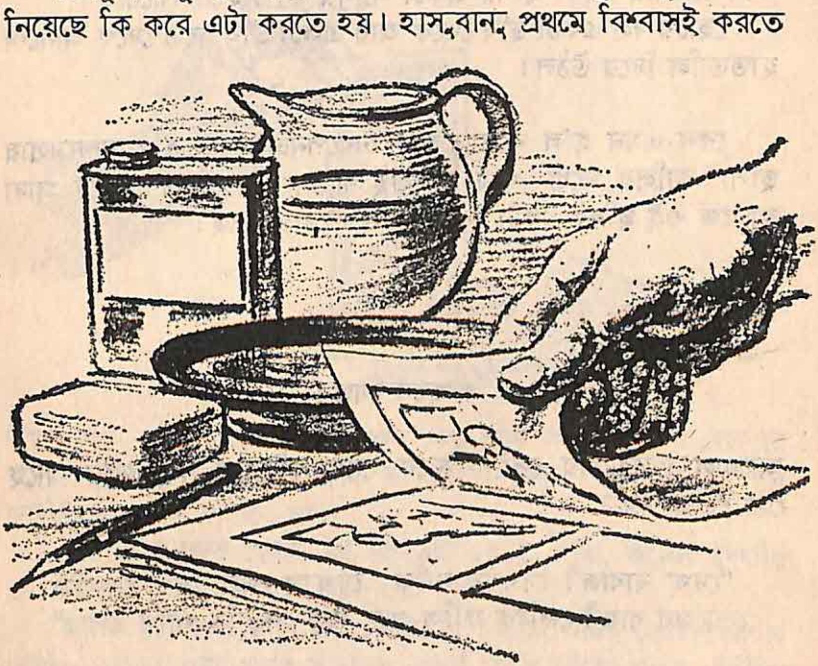
এই লেখকের অন্যান্য বই

কেমিক্যাল ম্যাজিক
চিকিৎসা বিজ্ঞানের আজব কথা
রসায়নের ভেল্‌কি
তত সহজ ছিল না
পদার্থবিজ্ঞানের খোশখবর
বুদ্ধি নিয়ে দারুণ মজা

ম্যাজিক ছবি

হাসুবানু কি একটা মজার জিনিস তৈরি করেছে বাড়ীতে—যেটা দিয়ে কাগজের উপর আঁকা যে কোনও ছবিকে অবিকল কপি করে সে তুলে নিতে পারে। ছোটর দল অর্থাৎ বাপ্পা, লবু-কুশু, বাবুন-মিঠুন, চন্দ্রভানু—ওরা অবাক হয়ে তাকিয়ে এই কান্ড দেখছে। কেমন করে হাসুবানু এই ম্যাজিকের মতো ব্যাপারটা হাসিল করছে—ছোটর দল কিছুতেই তা বুঝে উঠতে পারে না!

ডিংকু কিন্তু ইতিমধ্যে ওর মামার কাছ থেকে চুপি চুপি শিখে নিয়েছে কি করে এটা করতে হয়। হাসুবানু প্রথমে বিশ্বাসই করতে



চায়নি ডিংকুর কথা। ডিংকু বলল, আচ্ছা, বিশ্বাস না হয় আমি এক্ষুনি একটা ছবি কপি করে তোমাকে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি।

ডিংকু প্রথমে এক ভাগ টারপেনটাইন তেলের সাথে চার ভাগ জল মিশিয়ে একটা দ্রবণ তৈরি করল। তারপর পেন্সিলের পিছনে

যেমন ছোট্ট রবার দেওয়া থাকে ঠিক সেইরকম একটুকরো সাবান ওই দ্রবণে ফেলে দিয়ে সেটাকে ঝাঁকাতে লাগল যতক্ষণ পর্যন্ত সাবানটা জলে গুলে না যায়। ডিংকু বলল সাবানের টুকরো এখানে ইমালসানের কাজ করবে এবং টারপেনটাইন তেল এবং জলকে আলাদা হ'তে দেবে না। (টারপেনটাইন তেল এবং জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব আলাদা)

এবার সে আনন্দমেলা মাসিক পত্রিকার 'রাজা হওয়ার ঝকমারি' উপন্যাসের একটা সুন্দর ছবির গায়ে ওই তরল পদার্থটা খুব হালকা করে বুলিয়ে নিল। তারপর ডিংকু একটা পরিষ্কার সাদা কাগজে ঐ ছবিটার উপর চাপিয়ে একটা চামচের পিছন দিক দিয়ে কাগজটাকে বেশ জোরে জোরে ঘষতে লাগল। খানিক বাদে আস্তে আস্তে কাগজটাকে টেনে তোলার পর দেখা গেল অবিকল আনন্দমেলায় আঁকা ছবির একটা সুন্দর কপি হয়ে গিয়েছে!

ছোটর দল একটা ছবি থেকে আর একটা ছবি হতে দেখে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

কেন এমন হ'ল বলো তো? টারপেনটাইন তেল আনন্দমেলায় ছাপা কালির মধ্যে খুব সহজেই গুলে গিয়েছিল। তাই সাদা কাগজে ওই ছবির একটা নেগেটিভও উঠে এসেছে।

ফস্‌কে গেল!

আবোল তাবোলের সেই ফস্‌কে গেল কবিতার কথা মনে আছে তো তোমাদের?

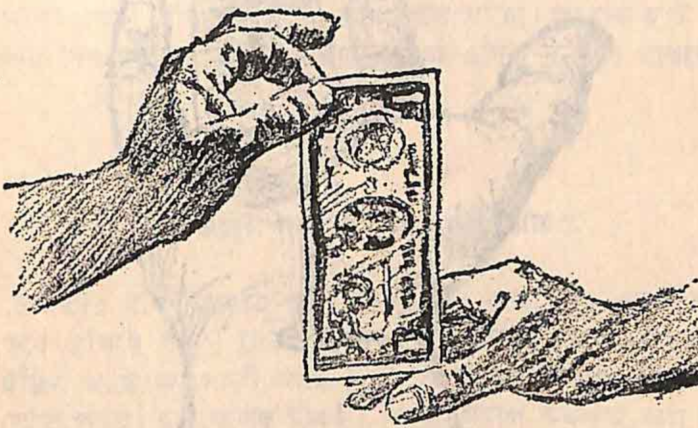
"দেখ্‌ বাবাজী দেখ্‌বি নাকি দেখ্‌রে খেলা দেখ্‌ চালাকি
ভোজের বাজী ভেল্কি ফাঁকি পড়্‌ পড়্‌ পড়্‌বি পাখি ধপ্‌।"

—না, এখানে ভোজের বাজী ভেল্কি ফাঁকি দিয়ে ধপ্‌ করে পাখী পড়বে না। আমরা যে মজার খেলা খেলবো তাতে আঙুলের ফাঁক দিয়ে ফস্‌কে যাবে তাজা করকরে দশ টাকার একটা নোট। কেমন করে এই খেলাটা দেখাবে সেটা এখন তোমাদের শিখিয়ে দিচ্ছি।

ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে ঠিক সেই ভাবে বাঁ হাত দিয়ে একটা নতুন টাট্‌কা দশ টাকার নোট ধরে রাখ। এবার নোটটা ছেড়ে দিলে যাতে ওটা ধরতে পারো সেই ভাবে তোমার ডান হাত বাড়িয়ে দাও। এখানে লক্ষ্য রাখবে নোটের গায়ে যেন তোমার ডান হাতের কোন আঙ্গুল লেগে না থাকে।

এবার বাঁ হাত থেকে নোটটা ছেড়ে দিলে তুমি ওটা সহজেই ডান হাত দিয়ে ধরে ফেলতে পারবে।

এস, এবার দেখি তুমি যখন বাঁ হাত দিয়ে নোটটা ছাড়বে তখন তোমার বন্ধু বা অন্য কেউ ডান হাত দিয়ে সেটা ধরতে পারে কিনা। তুমি তোমার ডান হাতের আঙ্গুল যে ভাবে নোটের দু'পাশে ওটাকে না ছুঁয়ে রেখেছিলে, তোমার বন্ধুও ঠিক সেই ভাবে তার আঙ্গুল রাখবে। এবার তুমি নোটটাকে ছেড়ে দাও। তোমার বন্ধুর দুটো



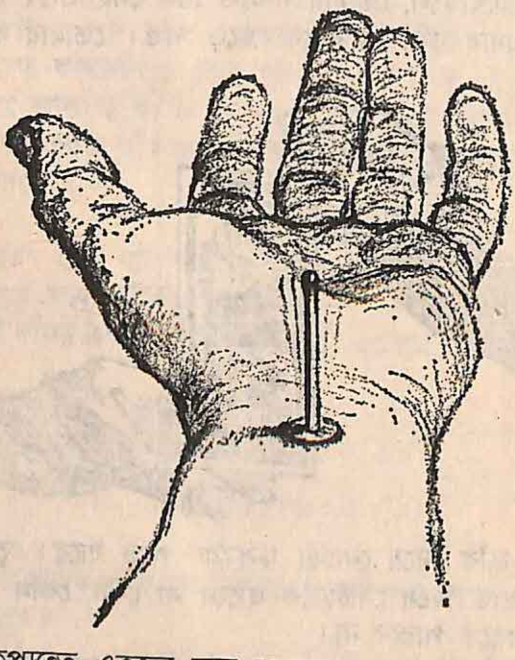
আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে নোটটা ফস্‌কে পড়ে যাবে। তুমি যতবার খুশী বাঁ হাত দিয়ে নোটটাকে ছাড়ো না কেন, কোন সময়েই সে নোটটাকে ধরতে পারবে না।

তোমার নিজের বেলায় যা সহজেই করতে পাচ্ছ, অন্যের বেলায় সেটা সম্ভব হচ্ছে না কেন বলো তো?

আসল ব্যাপারটা হ'ল তুমি নিজে এটা করার সময় তোমার মগজ নোটটা ছাড়ার এবং ধরার সংকেত একই সাথে দুটো হাতে পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু যখন তুমি নোটটা ছাড়বে অন্যের ধরার জন্য, তার মগজ প্রথমে সেটা পড়তে দেখবে, তারপর নোটটাকে ধরার সংকেত পাঠাবে হাতে। এই সময়ের ব্যবধানে নোটটা হাতের ফাঁক দিয়ে ফস্‌কে যাবে খুব সহজেই।

চিমটে আর কমণ্ডলু যেমন সাধু-সন্ন্যাসীর পরিচয়, স্টেথোস্কোপও তেমনি ডাক্তারকে চিনিয়ে দেয়। চোঙের মতো এই যন্ত্রটিকে ডাক্তারেরা গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ান।

এই যন্ত্রটা আবিষ্কার করেন ফরাসী দেশের এক ডাক্তার। তাঁর নাম লেন্নে। তিনি একদিন দেখলেন, ছেলেরা খেলা করবার সময়



কাঠের একপ্রান্তে একজন কান পেতেছে আর অপর প্রান্তে আর একজন কাঠের উপর টোকা মেরে খবর পাঠাচ্ছে। লেন্নে ভেবে দেখলেন, রোগীর বুকের ভিতর যে শব্দ হয়, তাও তো এই রকম বাইরে থেকে শোনা যেতে পারে। তিনি প্রথমে একরকম কাগজের চোঙা ও পরে একরকম কাঠের চোঙা ব্যবহার করে রোগীর বুকের রকমারি শব্দ কানে শুনতে পেলেন। আজকালকার স্টেথোস্কোপ তারই উন্নত সংস্করণ।

এই স্টেথোস্কোপেরও এখন উন্নতি হয়েছে অসম্ভব রকম।

ইলেকট্রো কার্ডিয়োগ্রাফ যন্ত্রে হৃদ্‌পিণ্ডের এই শব্দকে কতকগুলি দৃশ্যমান রেখায় রূপান্তরিত করে কত জটিল রোগনির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে।

এই স্টেথোস্কোপ থেকে আরম্ভ করে ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রাফ ইত্যাদি সবগুলো যন্ত্রেরই দাম খুব বেশি।

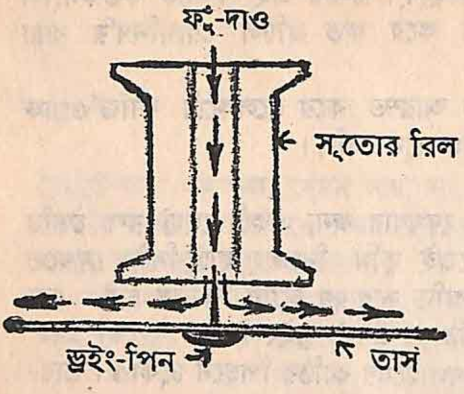
আমরা এখানে হার্টবিট্ দেখবার জন্য একটা ছোট্ট যন্ত্র তৈরি করব। এটা দিয়ে খুব সহজেই তুমি নিজের হার্ট-বিট্ দেখতে পারবে। এর জন্য আমাদের অতি সাধারণ দুটো জিনিষ চাই। এরা হচ্ছে একটা দেশলাইয়ের কাঠি ও একটা ড্রইং পিন।

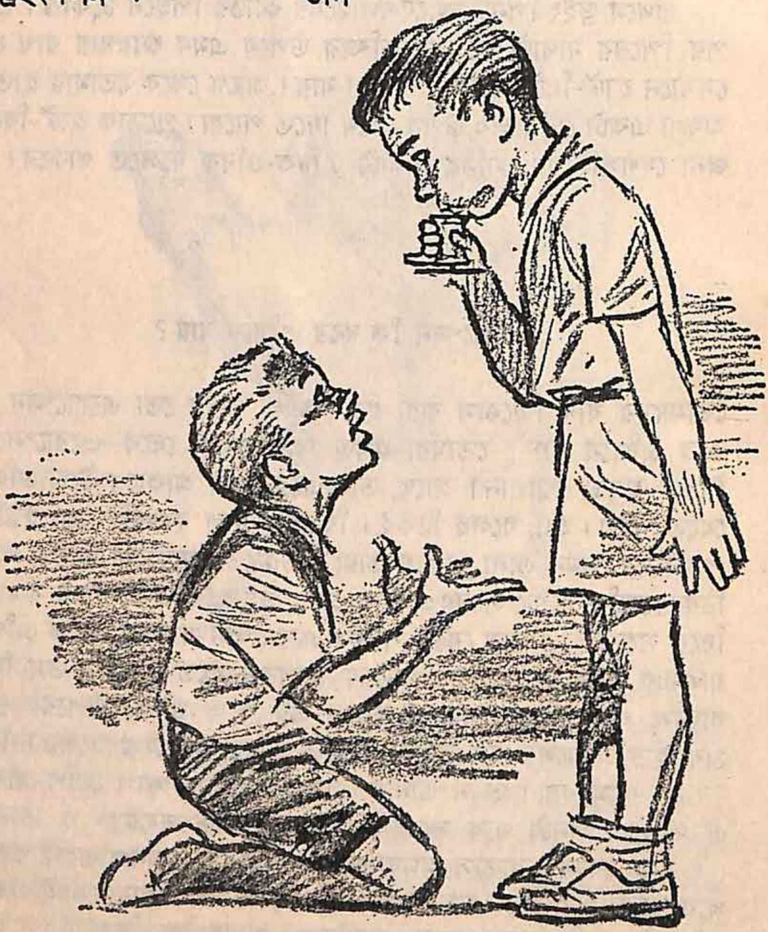
প্রথমে ড্রইং পিনটাকে দেশলাইয়ের কাঠির পিছনে ঢুকাও। তার-পর পিনের মাথাটা তোমার কব্জির উপরে এমন জায়গায় রাখ যেন সেখানে হার্ট-বিট্ শুনতে পাওয়া যায়। আগে থেকে তোমার হাতকে অবশ্য একটা টেবিলের উপর রেখে দিতে পারো। প্রত্যেক হার্ট-বিটের জন্য দেশলাইয়ের কাঠির মাথাটা এদিক-ওদিক দুলতে থাকবে।

এরোপ্লেন কি করে এগিয়ে যায় ?

তোমাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়—আচ্ছা বলো তো এরোপ্লেন কি করে এগিয়ে যায় ? তোমরা হয়ত তার জবাব দেবে—এরোপ্লেনের ইঞ্জিন আছে, জ্বালানী আছে, তাই এরোপ্লেন আকাশে উড়ে এগিয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, বলেছ ঠিকই। কিন্তু আসল কথাটাই বলা হয়নি। পাখীদের যেমন ডানা থাকায় তারা ইচ্ছামতো আকাশে উড়তে পারে, ঠিক তেমনি এরোপ্লেনেরও ডানা এমন ভাবে তৈরি যে সেটা সামনের দিকে সহজেই এগিয়ে যেতে পারে। এরোপ্লেন সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় তার ডানার নীচের তলের চাইতে উপরের তল দিয়ে বাতাস খুব জোরে বেরিয়ে যায়। এর ফলে ডানার উপরের দ্রুত প্রবাহিত বাতাসের চাপ ডানার নীচের তলের বাতাসের চাপের চাইতে অনেক কমে যায়। তখন ডানার নীচের বাতাসের চাপ বেশি থাকায় ঐ ভারী প্লেনটা খুব সহজেই ভেসে থাকতে পারে।

যখন কোনও বাতাস অথবা কোনও গ্যাস বা কোনও তরল পদার্থ খুব দ্রুত প্রবাহিত হয়—তখন তার চাপ কমে যায়। এই ছোট্ট ঘটনাটি আবিষ্কার করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত সুইস


ফুঁ-দাও
সুতোর রিল
ড্রইং-পিন
তাস



বিজ্ঞানী ড্যানিয়েল বারনৌলি। প্রবাহের গতিবেগ যত বেশি হবে তার চাপও তত কমবে।

সামান্য একটা পরীক্ষা করে এই ঘটনার সত্যতা যাচাই করা যায়। এতে যন্ত্রপাতিরও বিশেষ কিছু প্রয়োজন নেই। আমাদের লাগবে শুধু মাত্র একটা সুতার রিল, একটা বড় ড্রইং পিন (যে পিন দিয়ে কার্ড-বোর্ডে ছবি আটকানো যায়) ও একটা খেলার তাস।

প্রথমে ড্রইং পিনটাকে তাসের মাঝখান দিয়ে ঢুকিয়ে ঐ পিনের সাথে ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে ঠিক সেইভাবে সুতার রিলটা আটকে দাও। এবার একহাতে সুতার রিল ও অন্য হাত দিয়ে তাস-টাকে ধরে রিলের মাঝখানের ফুটোর মধ্য দিয়ে যত জোরে পার ফুঁ দাও। ফুঁ দেওয়ার সময় তাস থেকে তোমার হাতটা সরিয়ে নাও।

তোমার মনে হতে পারে তাসটা বুঝি এক্ষুনি মাটিতে পড়ে যাবে। কিন্তু মজা এই যে ওটা কখনই পড়বে না।

রিলের মাঝখানের ফুটোর মধ্যে দিয়ে ফুঁ দেওয়ার সময় বাতাস তাসের উপরতল দিয়ে খুব জোরে প্রবাহিত হয়ে সেখানকার বায়ুর চাপকে কমিয়ে দেয়। এদিকে তাসের নীচের তলের বায়ুর চাপ বেশি থাকায় ওটা তখন আর মাটিতে পড়ে যেতে পারে না।

ডিমের মধ্যে পাখীর ছানা

সুকুমার রায়ের সেই মজার কবিতা 'ছায়া-ধরা' বাংলাদেশের কোন্ ছেলেমেয়ে পড়েনি?

"আজগুবি নয়, আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা,
ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্রে হ'ল ব্যথা।"

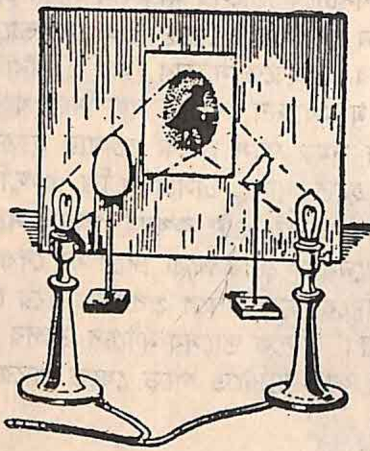
—না, এখানে আমাদের ছায়ার সাথে কুস্তি করার দরকার নেই, তবে ছায়া দিয়ে এমন একটা মজার খেলা দেখাবো যেটা দেখে সবাই খুব অবাক হয়ে যাবে। এটা দেখাতে হলে আমাদের চাই—

একটা তেলতেলে পাতলা কাগজ; মোটা কার্ড বোর্ড; দুটো টেবিল ল্যাম্প, দুটো কাঠের স্ট্যান্ড (টেবিল ল্যাম্পের সামনে ছবিতে দেখানো হয়েছে)।

প্রথমে মোটা কার্ড বোর্ডের উপর বর্গাকারে তেলতেলে কাগজ-টার মাপে কিছুটা জায়গা গর্ত করে নাও। এবার তেলতেলে কাগজ-টাকে পর্দার মতো আঠা দিয়ে ঐ জায়গায় আটকিয়ে দাও। পর্দার

পিছনে টেবিল ল্যাম্প দুটোকে রাখো। সামনের দিকে তোমার বন্ধুদের বসতে বলে বাঁ দিকের টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দাও।

এইবার একটা ছোট কার্ড বোর্ডের টুকরোকে ডিমের মতন করে কেটে টেবিল ল্যাম্পের সামনে আর একটা কাঠের স্ট্যান্ডের উপর আটকিয়ে সেটা আলো ও পর্দার মাঝামাঝি জায়গায় বসিয়ে দাও। তোমার বন্ধুরা পর্দার উপর ডিমের ছায়া দেখতে পাবে।

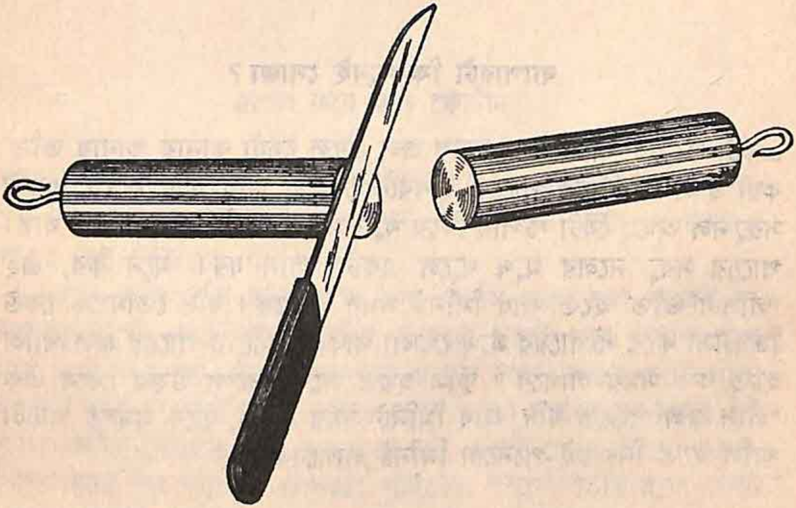


এইবার তোমাকে কৌশল করে ঐ ডিমের মধ্যে পাখীর ছানাকে দেখাতে হবে। এটা দেখানোর আগে তুমি জুতসই একটা গল্প ফেঁদে নিতেও পার। বন্ধুদের সামনে তুমি বলতে শুরু করে দিলে যে তোমার কাছে একটা এক্স-রে যন্ত্র আছে, যার সাহায্যে তুমি ডিমের মধ্যেকার ছানাকে দেখাতে পার। অবশ্য তাদের অনেকেই হয়ত তোমার কথায় সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে। যাই হোক, এটা দেখাতে হলে এবার তোমাকে ডানদিকের ল্যাম্পটা জ্বালতে হবে। ডানদিকের ল্যাম্প এবং পর্দার মাঝখানে যে ভাবে কার্ডবোর্ড দিয়ে ডিম তৈরি করেছিলে ঠিক সেই রকম ছোট্ট একটা পাখীর ছানা তৈরি করে কাঠের স্ট্যান্ডে আগে থেকে রেখে দিতে হবে। পাখীর ছানার ছায়াকে এবার ডিমের ছায়ার উপর দেখা যাবে। এর কিছুটা অংশকে ডানদিকের টেবিল ল্যাম্প আলোকিত করবে—যার ফলে ছায়াটা একটু ঝাপ্সা দেখাবে। তোমার বন্ধুরা সামনের দিকে বসে থাকায় পর্দার পিছনের এতসব কারসাজি কিছুই বুঝতে পারবে না। আর যারা পদার্থ বিদ্যা ও জীববিদ্যা জানে না, তারা তুমি ডিমকে কি করে এক্স-রে করেছ ভেবে খুব অবাক হয়ে যাবে।

সীসার চোঙের ভেল্‌কি

চুম্বক লোহাকে টানে। তোমার দু'খণ্ড চুম্বক থাকলে, একখণ্ডের উত্তরদিক্ অপর খণ্ডের দক্ষিণ দিক্‌কে আকর্ষণ করে ধরে রাখবে। তুমি একটা আস্ত চক্ অথবা পেন্সিলকে ভেঙে দু'টুকরো করে আবার কি তাদের জোড়া লাগাতে পার ?—না, পার না। কেননা পেন্সিল বা চকের ভেঙে যাওয়া টুকরো দুটো পরস্পরকে আকর্ষণ করে ধরে রাখতে পারে না।

কিন্তু যদি দুটো সীসার চোঙকে (Solid Cylinder) মুখোমুখি চেপে ধরা যায় তবে এক অবাক কাণ্ড হবে। চোঙ দুটো এত জোরে আটকে যাবে যে তাদের টেনে আলাদা করতে গেলে তোমাকে



বেশ মেহনত করতে হবে। একটা লোহার ছুরি দিয়ে আটকে যাওয়া চোঙের মাঝখানে খুব জোরে চাপ দিলে তবেই তাদের আলাদা করা যাবে। ব্যাপরটা খুবই মজার নয় কি ?

সীসার চোঙের এই সুন্দর ভেল্‌কি বাজীটা দেখিয়ে সবাইকে তুমি একেবারে তাক্ লাগিয়ে দিতে পারো। চোঙের মুখ দুটো

বেশ ভালো করে কেটে চেঁছে মসৃণ করে নিয়ে তাদের মুখোমুখি চেপে ধর। ও দুটো আটকে গেলে তাদের একটা লোহার স্ট্যাণ্ডের সাথে ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকে দাও। এইবার চোঙের তলার আংটায় একশো গ্রাম ওজন, তার নীচে একশো গ্রাম, এইভাবে ওজন ঝুলিয়ে দিলে দেখবে চোঙ দুটো প্রায় এক কিলোগ্রাম পর্যন্ত ওজনকে ধরে রাখতে পারছে।

সীসা হচ্ছে খুব নরম ধাতু। সীসার চোঙ দু'টির অণুদের মধ্যেকার আকর্ষণ বল এত বেশী যে, তাদের খুব কাছাকাছি আনতে পারলে এই বলের দরুণ তারা আটকে যায়। লোহা, সোনা অথবা তামার মতো শক্ত ধাতুর বেলায় তাদের দু'টুকরোর অণুরা এত কাছাকাছি আসতে পারে না। কাজেই দু'খণ্ড লোহা অথবা সোনাকে খুব কাছে এনে জোড়া

ব্যাপারটা কি খুবই সোজা?

একটা কাঁচের পাত্রে ত্রিশ গ্লাস জল ঢেলে সেটা কানায় কানায় ভর্তি করা হ'ল। কাঁচের পাত্রের উপরটা খোলা, আর তার নীচে একটা সরু নল আছে যেটা স্টপার দিয়ে খুশিমতো খোলা ও বন্ধ করা যায়। পাত্রের সরু নলের মুখ খুলে একটা গ্লাস ধর। মনে কর, এই গ্লাসটা ভর্তি হতে আধ মিনিট সময় লাগছে। যদি তোমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে স্টপারের মুখ খোলা থাকলে কাঁচের পাত্রের জল খালি হতে কত সময় লাগবে? তুমি হয়ত সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেবে এক গ্লাস জল পড়তে যদি আধ মিনিট সময় লাগে, তবে সমস্ত পাত্রটা খালি হতে নিশ্চয়ই পনেরো মিনিট লাগবে।

আচ্ছা, এবার স্টপার খুলে দিয়ে একটা ঘড়ি নিয়ে দেখ ওটা খালি হতে কতটা সময় লাগছে। তুমি অবাক হয়ে দেখবে সময় লেগেছে দ্বিগুণ—অর্থাৎ আধ ঘণ্টা। এটা কী করে হল বলো তো?

খুব ভালো করে দেখলে তবে বুঝতে পারবে, যে হারে জল পড়ে সেটা সব সময় এক থাকে না, ওটা বদলে যায়। প্রথম গ্লাস ভর্তি হ'য়ে যাবার পর দ্বিতীয় গ্লাসের জল ভর্তি হতে সময় আরও বেশী

লাগবে। কারণ পাত্রের জল কমে গেলে জলের উচ্চতা এবং সেই সাথে চাপও কমে যায়। ফলে তৃতীয় গ্লাস ভর্তি হতে সময় আগের চাইতে আরও বেশি লাগে।

কোনও পাত্রের উপরের মুখ খোলা থাকলে তার তরল পদার্থ নীচ দিয়ে যে বেগে বেরোয় তা নির্ভর করে ঐ তরল পদার্থের উচ্চতার উপর। এটা অঙ্ক কষে প্রথম বের করেন গ্যালিলিওর প্রিয় ছাত্র টরিসেলি। তাঁর সূত্র থেকেই সর্বপ্রথম জানা যায়, যে-বেগে তরল পদার্থ নীচেয় পড়ে তা কোন সময়েই ঐ তরলের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে না। উচ্চতা সমান হলে ভারী পারদ ও হাল্কা এ্যালকোহল একই বেগে পড়বে। আর যদি অভিকর্ষ বদলে যায়, তাহলে কি হবে বলো তো? তখনও কি তারা একই বেগে পড়বে? না, তা হয় না। চাঁদের অভিকর্ষ পৃথিবীর একের ছয় অংশের সমান। তাই চাঁদে এক গ্লাস জল ভর্তি হতে লাগবে পৃথিবীর চেয়ে আড়াইগুণ বেশি সময়।

ঠাণ্ডা করে জল ফোটান

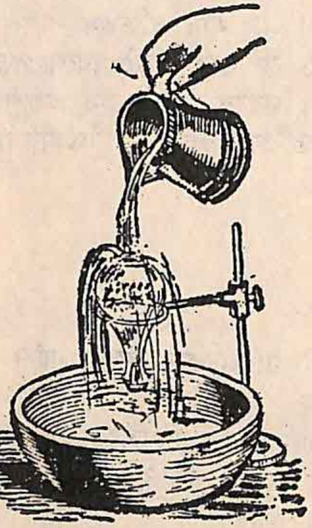
তোমরা সকলেই জান জলকে ফোটাতে হলে একশো ডিগ্রি সেন্টি-গ্রেড তাপমাত্রা প্রয়োজন। তুমি যখন ইচ্ছে তাপ দিয়ে যে কোনও পাত্রের জল ফোটাতে পার।

কিন্তু যদি তুমি হঠাৎ বলে বস, আমি গরম তো করবই না, উপরন্তু ঠাণ্ডা করে জল ফোটাব, তাহলে সবাই খুব অবাক হয়ে যাবে, তাই না?—হ্যাঁ, ঠাণ্ডা অবস্থায় জল ফুটতে দেখলে সবাই শুধু অবাকই হবে না, সেই সাথে মজাও পাবে খুব। ম্যাজিকের মতো এই ভোজবাজীটা দেখাতে হলে আমাদের চাই, একটা গোল কাঁচের ফ্লাস্ক, ক্ল্যাম্প আর রিং স্ট্যান্ড। ফ্লাস্কটা পাইরেক্স কাঁচের তৈরি হলে ফেটে যাবার ভয় থাকবে না।

ফ্লাস্কটায় অর্ধেক জল দিয়ে ভর্তি করে নিয়ে তাকে হিটার অথবা স্টোভের সাহায্যে গরম কর। জল ফুটতে আরম্ভ করলে ওটাকে বাইরে এনে তার মুখে ভাল করে একটা রবারের ছিপি আটকে দাও।

এইবার রিং-স্ট্যাণ্ডের সাথে ক্ল্যাম্প দিয়ে ফ্লাস্কের মুখ উপুর করে

আটকে রাখ এবং জল ফোটা বন্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। এখন ফুটন্ত জল ফ্লাস্কের উপর ঢাললেও তার ভিতরের জল ফুটবে না। কিন্তু এবার যদি তুমি ফ্লাস্কের উপর একটা ভিজে তোয়ালে রেখে ঠান্ডা বরফ জল ঢাল তাহলে এক অবাক-করা কান্ড হবে—সাথে সাথে ফ্লাস্কের ভিতরের জল টগবগ করে ফুটতে আরম্ভ করবে। ফুটন্ত জল যে কাজ করতে পারেনি, বরফ জল কি করে তা' করল ভেবে সবাই খুব অবাক হয়ে যাবে। ফ্লাস্কের জল টগবগ করে ফুটছে অথচ পাত্রটা খুব বেশি গরম নয়—এর কারণ কী বলো তো?

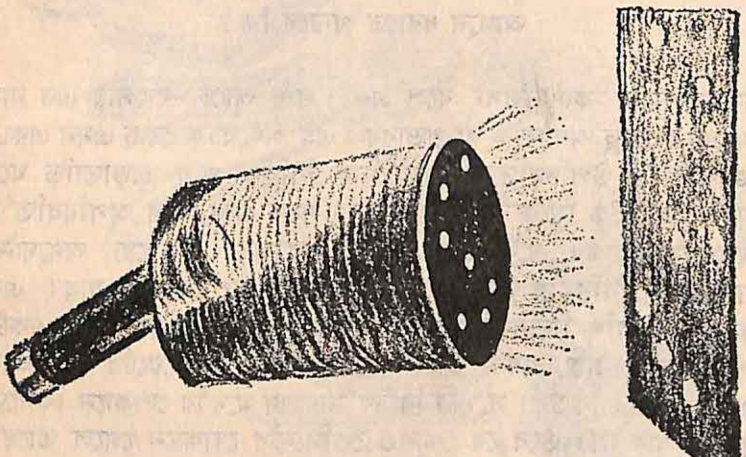


আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, তুমি যখন ঠান্ডা বরফ জল ঢালছ তখন পাত্রের ভিতরের বাষ্প জমে জল হয়ে যাচ্ছে। প্রথমবার জল ফোটার সময় ফ্লাস্কের ভিতরের সমস্ত বায়ু বেরিয়ে গিয়েছিল, তাই এখন ঐ জলের উপর চাপ খুবই কম। তাই চাপ কম হবার ফলে জল কম তাপে ফুটতে থাকে। যদিও ঐ ফুটন্ত জল গরম নয়।

প্ল্যানেটারিয়াম নিয়ে খেলা

রবিবার দিন সকাল বেলায় ডিংকু, বাবুন-মিঠুন, লবু-কুশু ওরা সবাই ছোট মামার সাথে বিড়লা প্ল্যানেটারিয়াম দেখতে গিয়েছিল। প্ল্যানেটারিয়ামের ভিতরটা আস্তে আস্তে অন্ধকার হ'য়ে এল আর দেওয়ালের গায়ে ফুটে উঠতে লাগল রাশি রাশি তারা। ছোটমামা ওদের বুঝিয়ে দিলেন—টেলিস্কোপের সাহায্যে দিনের বেলায় হারিয়ে যাওয়া তারাদের কি-ভাবে আকাশ থেকে ধরে এনে ঐ ছোট্ট প্ল্যানেটারিয়ামের মধ্যে নিয়ে আসা হ'চ্ছে। ছোটর দল সেদিন প্ল্যানেটারিয়াম দেখে অবাক হ'য়ে গিয়েছিল খুব।

তৈরি করবে নাকি তোমরা ঐ রকম ছোট্ট একটা প্ল্যানেটারিয়াম ?



আচ্ছা, তাহলে ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে ঠিক সেই রকম গোল একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স আর টর্চ জোগাড় কর। তোমাদের বিজ্ঞান অথবা ভূগোলের বইতে কালপুরুষ, সপ্তর্ষি মণ্ডল ইত্যাদি কত তারার ছবি দেওয়া থাকে। বই থেকে এই রকম যে কোনও একটা তারামণ্ডল বেছে নিয়ে একটা পাতলা কাগজের সীটের উপর ওটা পেন্সিল দিয়ে এঁকে নাও। তারপর ড্রইং করা মুখটাকে বাক্সের

বাইরের দিকে রেখে আঠা দিয়ে আটকে দিতে হবে। এখন ঐ পেন্সিল দিয়ে আঁকা তারার ফোঁটাগুলির মধ্যে নরুণ চালিয়ে ফুটো কর।

এইবার তোমার প্ল্যানেটরিয়াম তৈরি হ'য়ে গেল। এটাকে চালাতে হলে একটা অন্ধকার ঘরে যেতে হবে। একটা টর্চ জ্বেলে বাক্সের খোলামুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। টর্চটাকে এমন ভাবে হেলিয়ে রাখ যাতে ওর আলোটা সরাসরি তোমার নরুণ দিয়ে কাটা কাগজের ফুটোয় না প'ড়ে বাক্সের গায়ে লাগে। সাদা দেওয়ালের উপর তোমার তৈরি প্ল্যানেটরিয়ামের ছবি সুন্দর ফুটে উঠবে। বাক্সটাকে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে তুমি তারামন্ডলের সব অংশই খুব ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারো।

আগুন ধরাতে পারবে কি ?

রসায়নশাস্ত্রে 'ক্যাটালিস্ট' বলে একটা শব্দ আছে—বাংলায় এর নাম দেওয়া হয়েছে অণুঘটক বা প্রভাবক। এই অণুঘটক হচ্ছে এমন একটা জিনিষ যার উপস্থিতিতে রাসায়নিক বিক্রিয়া খুব তাড়াতাড়ি ঘটে যায়। অণুঘটক নিজে কিন্তু বিক্রিয়ার সময় এবং পরে অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। খুব ছোট্ট একটা পরীক্ষার সাহায্যে অণুঘটক রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য যে কত দরকারী তা দেখানো যায়। এর জন্য খুব বেশি জিনিষপত্তরও লাগবে না। তোমার চাই শুধু একটা দেশলাইয়ের বাক্স, একটা কাঁচের প্লেট, কিছু সিগারেটের ছাই আর একটা সুগার কিউব। সুগার কিউব সাধারণ মুদীর দোকানে কিনতে পাওয়া যায় না। তবে যে কোনও কেমিষ্টের দোকানে গেলে তাদের কাছে এটা পাওয়া যাবে।

প্রথমে সুগার কিউবটাকে কাঁচের প্লেটের উপর রাখ। তারপর দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে ওই সুগার কিউবে আগুন ধরাতে চেষ্টা কর।—কি, পারছ না ওতে আগুন ধরাতে ? তুমি পুরো একটা দেশলাই শেষ করেও কিউবটাতে আগুন ধরাতে পারবে না। আচ্ছা, এবার কিছুটা সিগারেটের ছাই নিয়ে সুগার কিউবটার একধারে বেশ ভালো করে ঘষো। তারপর ছাই লেগে রয়েছে এমন জায়গায় আগুন লাগাও।

তুমি অবাক হয়ে দেখবে সঙ্গে সঙ্গে ঐ চিনির ঢেলায় আগুন ধরে গিয়েছে।

সিগারেটের ছাই এখানে অণুঘটক হিসাবে কাজ করে সুগার



কিউবকে জ্বলতে সাহায্য করেছে। ছাই নিজে জ্বলতে পারে না এবং সুগার কিউব পোড়ার সময় এবং পরে এই ছাইয়ের কোনও পরিবর্তন হয়নি।

বরফটাকে তোল দেখি !

এক গ্লাস জলের মধ্যে একটা ছোট্ট বরফের টুকরো ভাসছে। প্রায় চার ইঞ্চি লম্বা একটা সুতা তোমার হাতে দিয়ে যদি কেউ বলে—আঙুল না দিয়ে শুধুমাত্র এই সুতার সাহায্যে তুমি বরফটাকে গেলাস থেকে তুলে আনতে পার কি ?

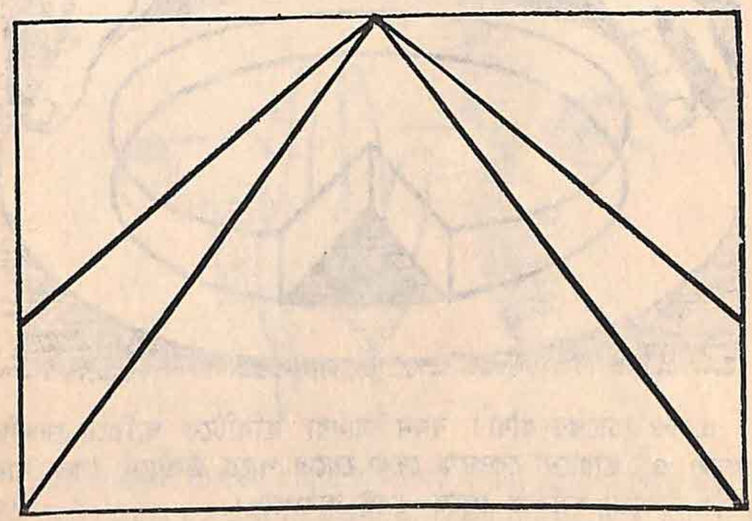
তুমি হয়ত ভাববে এটা একটা ধাঁধা। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে একটু চালাক সে বলবে—হ্যাঁ, আমি এটা করতে পারব, তবে এর জন্য আমার চাই নুনের একটা ছোট্ট ডিপো।



চালাক ছেলেটি নিশ্চয়ই এই সুতাটাকে বরফের টুকরোর মাঝ বরাবর রাখবে, ছবিতে যেমনটি দেখানো হয়েছে। তারপর কিছুটা নুন বরফের উপর (যেখানে সুতাটা আছে) ছিটিয়ে দেবে। একটু বাদেই তুমি দেখবে সুতার ধারেকাছের বরফ গলতে শুরু করেছে। গলার সময় বরফ আশপাশের জল থেকে কিছুটা তাপও নিয়ে নেবে। এর ফলে ঐ জল খুব ঠাণ্ডা হয়ে আবার সুতার গায়ে বরফ হয়ে আটকে যাবে। মিনিট দুয়েক বাদে সুতায় টান দিলে বরফের টুকরোটাও তার সাথে উঠে আসবে। বরফের টুকরোটাকে গেলাসের বাইরে বের করে এনে দেখ সুতাটা কেমন সুন্দর ভাবে ওর সাথে আটকে গিয়েছে !

বৃত্ত এল কোথা থেকে ?

সূর্যের আলো যে আসলে সাতটা রং দিয়ে তৈরি, এটা বিখ্যাত বিজ্ঞানী নিউটন একটা ছোট্ট পরীক্ষা করে দেখান। একটা গোল কাঠের অথবা টিনের চাকতির মাঝখানটা ফুটো করে সেটাকে একটা কাঠের স্ট্যান্ডের উপরের পেরেকের মধ্যে ঢুকাও। এবার ওই চাকতির গায়ে পর পর সাতটা রং (VIBGYOR) বাংলায় যাকে বলা হয় বেগানী-সহকলা অর্থ বেগুনী, গাঢ় নীল, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা এবং লাল রং লাগাও। যখন চাকতিটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে তখন তুমি সাতটা রংই বেশ পরিষ্কার দেখতে পাবে। কিন্তু মজা এই যে, ওটাকে খুব জোরে ঘুরিয়ে দিলে আর কোন রংই দেখা যাবে না—একটা সাদা রং দেখা যাবে।

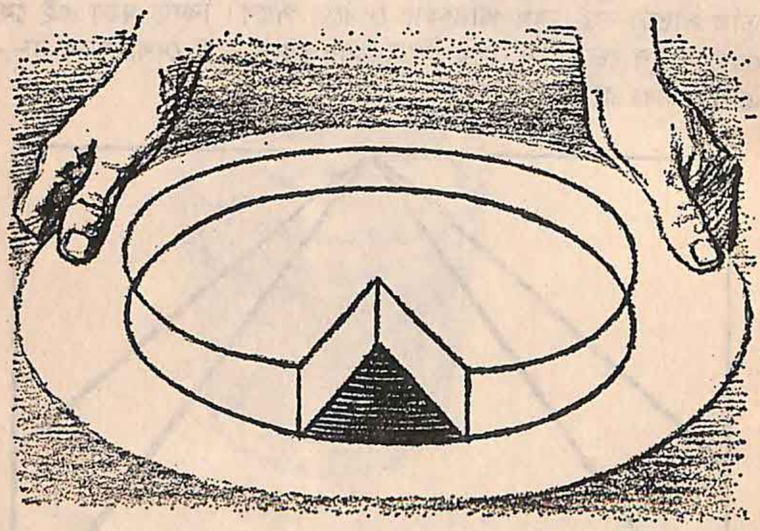


আচ্ছা, এবার এস আর একটা খেলা দেখা যাক্। একটা আয়তাকার পিচবোর্ড নিয়ে তার উপর ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেই রকম চারটে মোটা লাইন আঁক। এবার পিচবোর্ডের কেন্দ্রের ভিতর একটা আলপিন ঢুকিয়ে বোর্ডটাকে ঘুরালে এক মজার কান্ড হবে। তুমি দুটো এককেন্দ্রীয় বৃত্ত দেখতে পাবে।

এটা অবশ্য চোখের ধাঁধা ছাড়া আর কিছুই নয়। শুধুমাত্র চারটে কালো লাইন এঁকে এ-কাজ সারা যায়। তবে ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে ঠিক সেই রকম আরো চারটে লাইন এর উল্টোদিকে বসালে বৃত্তগুলো আরো বেশি পরিষ্কার চোখে পড়বে।

হারানো কেক খুঁজে বের কর

ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটুকরো কেক কেউ কেটে নিয়েছে। তুমি সেটা খুঁজে বের করতে পারবে কি ?—পারছ না ? আচ্ছা, এবার ছবিটিকে উল্টে দেখ, ওই হারানো কেকটা তুমি পেয়ে যাবে।

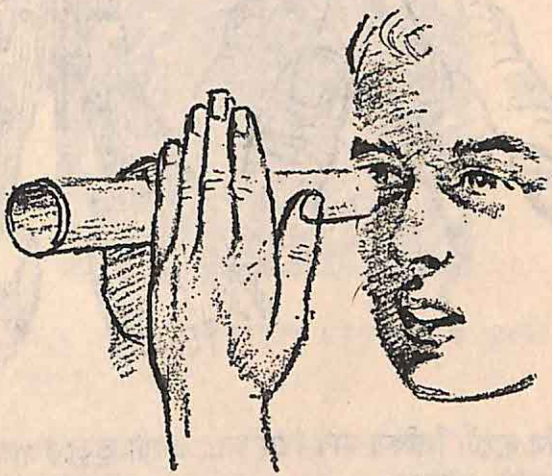


এটাও চোখের ধাঁধা। যখন আমরা ছবিটিকে ঘুরিয়ে দেখছি তখনও ওই হারানো কেককে দেখা যেতে পারে, উল্টানো কেক যার একটা টুকরো হারিয়ে গেছে—সেই অবস্থায়।

কিন্তু যেহেতু কখনই আমরা একটা কেককে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি না, তাই উপর থেকে দেখলে আমাদের বৃত্তগুলোকে কেকের দেওয়াল বলে মনে হয়। আর সরল রেখাগুলোকে কেকের টুকরো বলে বোধ হবে, সমস্ত কেক থেকে গর্ত করে একটুকরো সরানো হয়েছে মনে হবে না।

হাতের তালুর মাঝখানটা ফুটো হ'ল কি করে ?

কাগজের একটা সীট নিয়ে সেটা টিউবের মতো করে গুটিয়ে নাও। টিউবের একদিকের খোলা মুখে তোমার ডান চোখ রাখ। আর বাঁ হাতের তালু ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে ঠিক সেইভাবে তোমার মুখের সামনে ধর। তোমার হাতের তালু যেন কাগজের টিউবের গায়ে লেগে থাকে। এইবার দু'চোখ খুলে দেয়ালের কোন একটা জায়গায় ফোকাস কর। তোমার মনে হবে বাঁ হাতের তালুর ফুটোর ভিতর দিয়ে তুমি দেখছ। হাতটাকে এগিয়ে অথবা পেছিয়ে এমন একটা জায়গা তুমি বার করতে পার যেখান থেকে দেখলে মনে হবে তুমি বুঝি তালুর ঠিক মাঝখানের একটা ফুটোর মধ্যে দিয়ে দেখছ।

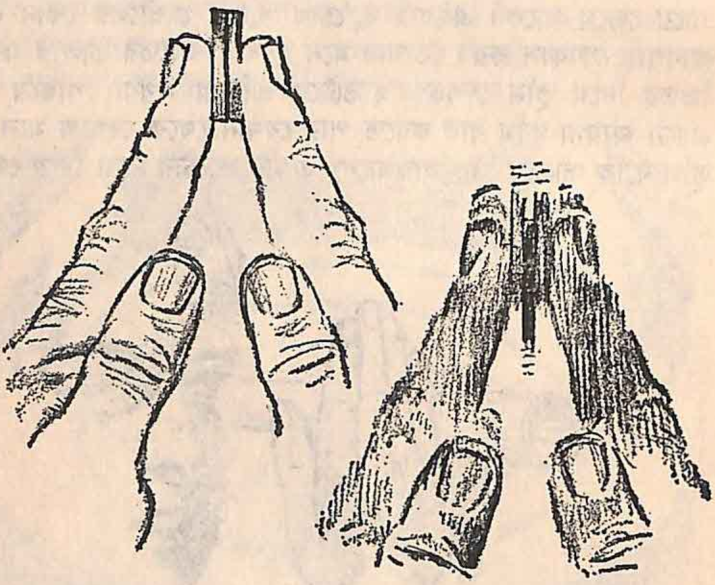


এটাও একটা চোখের ধাঁধা। আমাদের বায়নাকুলার দৃষ্টির জন্যেই এটা ঘটে। হাতে ফোকাস না হওয়া বাঁদিকের চোখের ছবি ডান চোখ দিয়ে দেখা ছবির সাথে মিশে যায়। আর তার জন্যেই এই রকম একটা মজার ব্যাপার হয়।

যদি তুমি বাঁ হাতের তালুর উপর দু'চোখ রাখ তাহলে ঐ গর্ত আর দেখতে পাবে না। কিন্তু ওখান থেকে চোখ দুটোকে সরিয়ে নিয়ে দেওয়ালে ফোকাস করলে, ঐ ভূতুড়ে ফুটো আবার তোমার হাতের তালুতে ফিরে আসবে!

ভূতুড়ে পয়সা

খুব সহজে একটা চোখের ধাঁধার মজার খেলা দেখানো যায়। দুটো সিকি নিয়ে তাদের ছবিতে যে ভাবে দেখানো হয়েছে—সেই ভাবে দুটো আঙুল দিয়ে ধর। এইবার ওদের বারে বারে উপর-নীচ করে



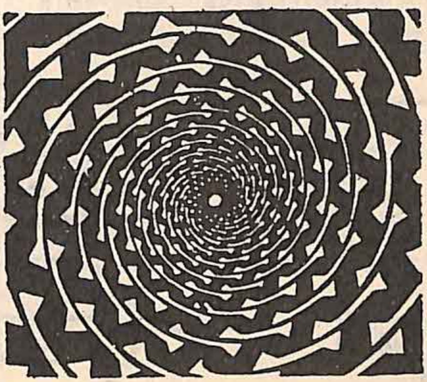
ঘষো। তুমি দুটো সিকির মাঝখানে আর একটা ভূতুড়ে পয়সা দেখতে পাবে—কিছুটা নীচুতে।

ভূতুড়ে পয়সাটা সব সময় নীচের দিকেই দেখা যায়। উপরে দেখা যায় না কেন—এর সদুত্তর পাওয়া খুবই মুশকিল।

প্যাঁচানো লাইনের মজা

নীচের ছবিটা দেখে তোমাদের কি মনে হচ্ছে বলো তো? তুমি হয়ত ভাবছ কেন্দ্রের সাদা বিন্দু থেকে একটা স্ক্রু-এর মতো প্যাঁচানো লাইন ঘুরে ঘুরে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

আচ্ছা, এইবার একটা পেন্সিল নিয়ে এই প্যাঁচানো জায়গার যে কোনও অংশে দাগ দিয়ে দেখ, কি হয়। কি মনে হচ্ছে এবার? এটা প্যাঁচানো লাইন নয়, তাই না? আসলে অনেকগুলো এককেন্দ্রীয় বৃত্ত

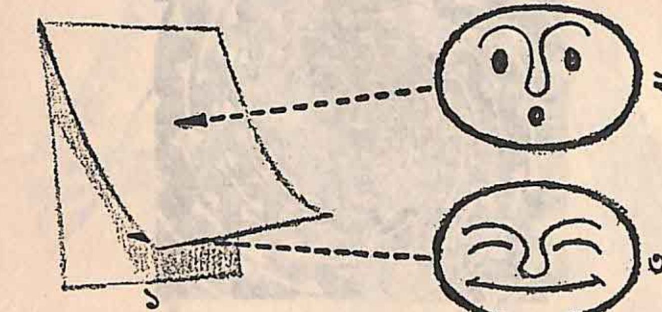


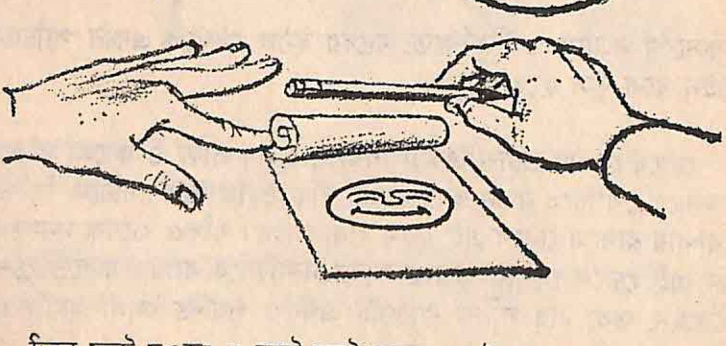
একসঙ্গে রয়েছে এই ছবিতে, যাদের হঠাৎ দেখলে একটা প্যাঁচানো লাইন বলে ভুল হতে পারে।

চোখে দেখার এটাও একটা বিখ্যাত ভুল। সাদা ও কালো দড়িকে একসাথে পেঁচিয়ে নতুন আর একটা দড়ি তৈরি করে সেটাকে বিভিন্ন অবস্থায় রাখলে চোখে এই রকম ধাঁধা লাগে। যদিও অনেক মনস্তত্ত্ব-বিদ এই চোখে দেখার ভুলের কারণ নানাভাবে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন, তবু এর সঠিক কারণটি এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

হাতে তৈরি সিনেমা

সিনেমা কি ভাবে দেখানো হয় তা তোমরা সবাই জান। প্রোজেক্টারের সাহায্যে ফিল্মের কতকগুলো স্থির চিত্র খুব তাড়াতাড়ি পর পর পর্দার উপর ফেলে সিনেমা দেখানো হয়। তুমি সামান্য একটা গুটানো কাগজ আর একটা পেন্সিল ব্যবহার করে খুব সহজেই এই রকম একটা খেলনা সিনেমা নিজের হাতে তৈরি করতে পারো।



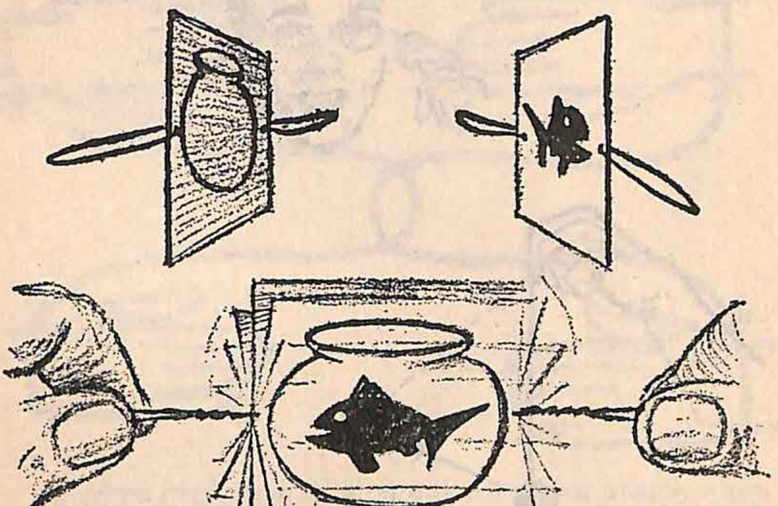


তিন ফুট চওড়া ও আট ফুট লম্বা একটা আয়তাকার কাগজকে প্রথমে দু-ভাঁজ কর। কাগজের উপরের পাতায় যেমন দেখানো হয়েছে ঠিক সেইরকম দু' নম্বর ছবিটা আঁকতে হবে আর ভিতরের পাতায় আঁক তিন নম্বর ছবি। এবার উপরের কাগজটাকে টিউবের মতো করে গুটিয়ে রাখ।

তোমার বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে উপরের পাতার একটা কোণ ধরে রাখ। এবার ডান হাতে একটা পেন্সিল নিয়ে ঐ উপরের গুটানো ছবিটাকে খুব তাড়াতাড়ি পাট করে ও আবার গুটিয়ে নিলে সিনেমার ছবি যেমন নড়াচড়া করে ঠিক তেমনি একটা মজার ছবি দেখতে পাবে।

ছবির মাছ ঢুকল হাঁড়ির মধ্যে

দেড় ইঞ্চি পুরু একটা পিচবোর্ড চৌকা করে কেটে নাও। ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে দু'পাশে দুটো ফুটো করে তার মধ্যে একটা ছোট দাঁড় পরাও। এবার পিচবোর্ডের একদিকে একটা মাছ ও উল্টোদিকে একটা বড় হাঁড়ি আঁক। তোমার হাতের বুড়ো

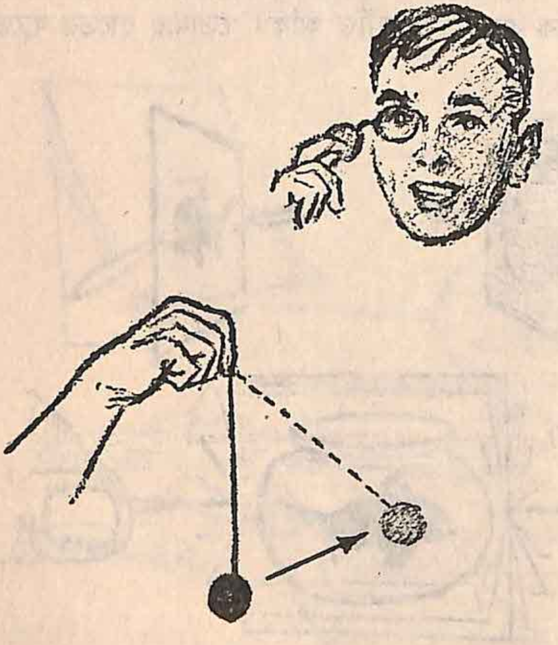


আঙুল ও তর্জনী ব্যবহার করে দড়ি দুটো ধর। এখন বুড়ো আঙুল তর্জনীতে বুলিয়ে পিচবোর্ডটাকে খুব তাড়াতাড়ি ঘুরাতে থাকো। পিচবোর্ডটা যখন জোরে ঘুরবে তখন তুমি দেখবে এক অবাক কান্ড, মাছটা হাঁড়ির মধ্যে ঢুকে আছে।

আমাদের চোখের সামনে থেকে কোনও ছবিকে সরিয়ে নেওয়ার পরেও এক সেকেণ্ডের কিছু কম সময়ের জন্য চোখের অক্ষিপট সেই ছবি ধরে রাখতে পারে। তাই পিচবোর্ডটা জোরে ঘুরবার সময় মনে হয় মাছটা হাঁড়ির মধ্যে ঢুকে আছে।

পেণ্ডুলামের দোলন

একটা পেণ্ডুলাম ও একজোড়া গগল্‌সের কাঁচ দিয়ে খুব চমৎকার একটা ম্যাজিকের মতো মজার ব্যাপার করা যায়। এই খেলাটাও দেখাতে বেশি জিনিষপত্তরও লাগে না এবং খেলাটাও খুব সহজ। তোমরা বাড়ীর সবাইকে এই খেলা দেখিয়ে একেবারে তাক্ লাগিয়ে দিতে পারো।



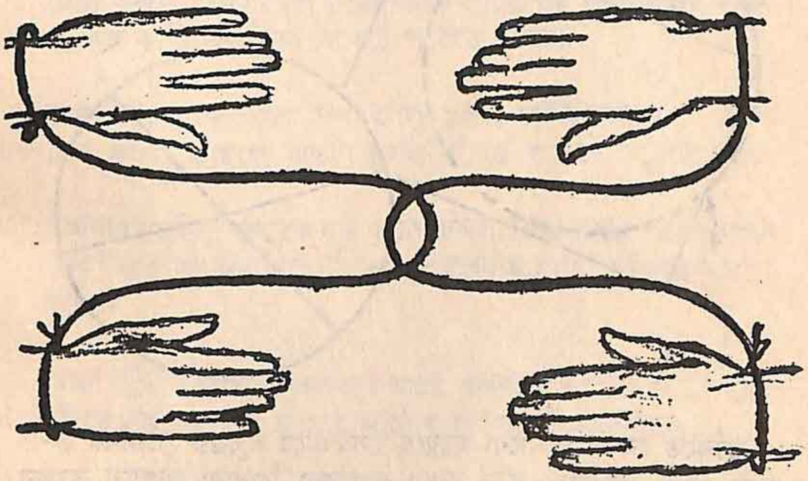
ছোট একটা টিনের চাক্‌তি অথবা জুতোর কালির কৌটা ফুটো করে তার মধ্যে একটা এক ফুট দড়ি ঢুকাও। তোমার কোনও বন্ধুকে ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে ঐ দড়িটাকে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো দোলাতে বলো।

এবার তুমি ডান চোখে একটা কাচ লাগিয়ে ঐ পেণ্ডুলামের দিকে

তাকাও। তোমার দুটো চোখই খোলা রাখতে হবে। তোমার মনে হবে পেণ্ডুলামটা ঘড়ির কাঁটার মতো বৃত্ত করে ঘুরছে। কাচটাকে বাঁ চোখে দিয়ে এবং আগের মতো দুটো চোখই খুলে আবার পেণ্ডুলামের দোলনের দিকে তাকাও। এবার তোমার মনে হবে ওটা বৃত্তাকার পথে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরছে!

বুদ্ধি নিয়ে খেলা

এই খেলায় ছ'জন বা আটজন লোক চাই। তোমার দু'জন বন্ধুর হাতের কব্জিতে ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে ঠিক সেই ভাবে দড়ি লাগিয়ে ওটাকে শেকলের মতো করে জুড়ে দাও। অন্যদের হাতেও ঠিক একই ভাবে দড়ি বেঁধে দুটো দড়িতে শেকল লাগাও।



দড়িটাকে কেটে অথবা না খুলে যারা এই শৃঙ্খল ছাড়াতে পারবে, তাদের বুদ্ধি সবচাইতে বেশি।

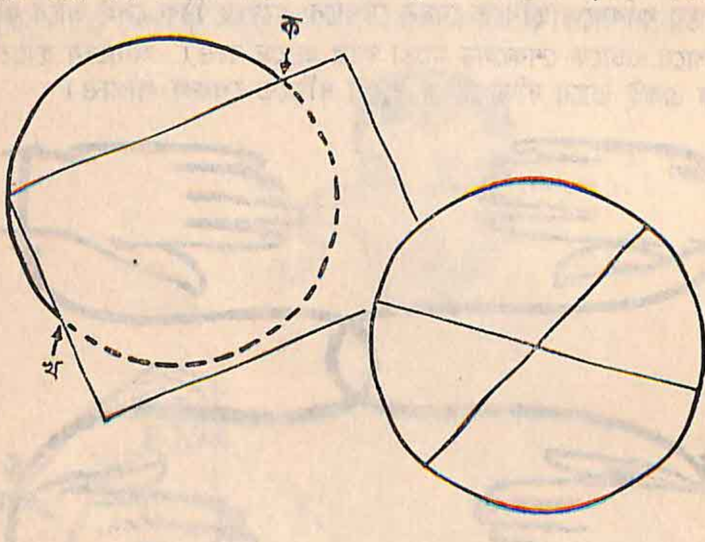
এই খেলার মতলবটা সহজে সবাই ধরতে পারবে না। যারা আগে থেকে শিখেছে শুধু তারাই এই শেকল খুলে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারবে।

খেলার মতলবটা তোমাদের এবার শিখিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে যে কোনও একটা দড়ির কেন্দ্র (অথবা মাঝখানটা) অপর জনের হাতের

কব্জির দড়ির পেছনে ঠেলে দাও। তারপর দড়িটাকে ঠেলতে হবে হাতের উপরে। আবার দড়িটা নীচ দিয়ে ওটাকে টেনে আনলেই ওই শৃঙ্খল মুক্ত হবে।

বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু আঁকতে কম্পাস লাগবে কি ?

বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু বের করবার জন্য তোমরা নিশ্চয়ই ক্লাশে কম্পাস ব্যবহার করে থাকো। এখানে আমরা ইনস্ট্রুমেন্ট বাক্সর কম্পাস ছাড়াই একটা সহজ উপায়ে এই কেন্দ্র বার করবো। সাধারণতঃ কমার্শিয়াল আর্টিস্টরা এই পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু বের করেন।



ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে বৃত্তের পরিধির উপর একটা পুরু কাগজের সীট রাখ। কাগজের কিনারা যেখানে বৃত্তের কালো দাগ স্পর্শ করবে সেখানে 'ক' ও 'খ' দাগ দাও। এটা করার জন্য তুমি কাগজের সীটকে বৃত্তের যে কোনও জায়গায় রাখতে পার, অসুবিধা নেই। এই 'ক' ও 'খ' হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসের শেষ বিন্দু। এইবার কাগজের সীটটাকে স্কেলের মতো ব্যবহার করে 'ক' ও 'খ' বিন্দুতে ব্যাস টানো। ঠিক এইভাবে আগে যেমন 'ক' ও 'খ' বিন্দু এঁকেছ সেই রকম 'গ' ও 'ঘ' বিন্দু এঁকে আর একটা ব্যাস তৈরি কর। এই দুটো ব্যাস যেখানে মিলিত হচ্ছে সেটাই বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু।

দেশলাইয়ের কাঠির খেলা

সামান্য একটা দেশলাইয়ের বাক্স দিয়ে যে কতো রকম মজার খেলা দেখানো যায় তার শেষ নেই। এখানে তোমাদের সেইরকম ছোট্ট একটা দেশলাইয়ের কাঠির খেলার কথা বলছি।

১। প্রথমে একটা দেশলাইয়ের বাক্স তোমার বন্ধুর হাতে দিয়ে তাকে ১ থেকে ১০-এর মধ্যে যে কোনও সংখ্যার কাঠি পকেটে পুরতে বল।

২। এবার যতগুলো কাঠি পড়ে থাকবে সেটা গুণে সংখ্যা দুটোকে যোগ করতে হবে। যোগ দেওয়া হয়ে গেলে ওই যোগফলের সমান সংখ্যক কাঠিকেও তার পকেটে পুরতে বলো।

যেমন ধরা যাক গুণে দেখা গেল ১৬টা কাঠি রয়েছে। এবার ৬+১=৭ হ'ল; তাহলে সাতটা কাঠি সরিয়ে পকেটে পুরতে হবে।

৩। এইবার তোমার বন্ধুকে যত কাঠি দেশলাইয়ের বাক্সে পড়ে থাকবে তার থেকে ইচ্ছামতো কাঠি তুলে হাতের মুঠোয় লুকিয়ে রাখতে বলো।

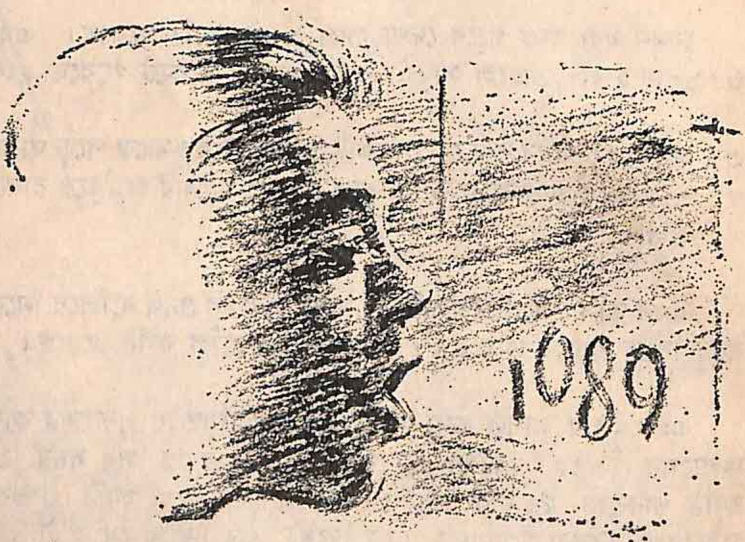
এখন তুমি খোলা দেশলাইয়ের বাক্সে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই বলে দিতে পারবে তার হাতের মুঠোয় কতগুলি কাঠি রয়েছে।

এই খেলার আসল মজা লুকিয়ে আছে দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যকলাপের ভিতর। কারণ এই পর্যায়ের পর বাক্সে সব সময় ৯টা কাঠি থাকবে। তোমার বন্ধু হাতের মুঠোর মধ্যে কাঠি নেওয়ার পর দেশলাইয়ের বাক্সে এক নজর দিয়েই তার ভিতর যে ক'টা কাঠি অবশিষ্ট থাকবে ৯ থেকে সেই সংখ্যা বাদ দিতে হবে। এটাই হ'চ্ছে বন্ধুটির হাতের মুঠোয় লুকিয়ে রাখা কাঠির সংখ্যা।

ম্যাজিক জানালা

এই খেলার নাম ম্যাজিক জানালা বলছি কেন জান ? জানালার উপর ম্যাজিকের মতো তোমার বন্ধুর গোনা সংখ্যাগুলো সব ফুটে উঠবে !

কি করে এটা খেলতে হবে এখন সেটা শিখিয়ে দিচ্ছি। তোমার বন্ধুকে শতকের ঘরের যে কোনও একটা সংখ্যা লিখতে বল—যেন তার প্রথম এবং শেষ সংখ্যার বিয়োগ ফল কমপক্ষে ২ হয়। মনে কর সে লিখল ৯০১ ; এই সংখ্যাটাকে আবার উল্টে লিখতে বল। এরপর ছোট সংখ্যাকে বড় সংখ্যা থেকে বাদ দিতে হবে। (৯০১—১০৯=৭৯২) ; সবশেষে বাদ দেওয়ার পর যা উত্তর পাওয়া গেল তাকেও উল্টিয়ে লিখে আগের সংখ্যার সাথে যোগ দাও (২৯৭+৭৯২ = ১০৮৯)।

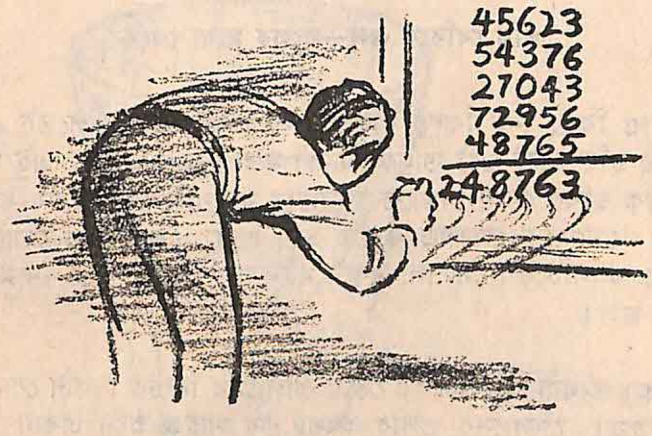


এইবার তুমি তোমার বন্ধুকে ঘরের একটা জানালা দেখিয়ে তার কাচের গায়ে মুখ দিয়ে ফুঁ দিতে বল। সে অবাক হয়ে দেখবে জানালার কাচের উপর ১০৮৯ এই সংখ্যাটি ম্যাজিকের মতো ফুটে উঠেছে !

আসলে তুমি তিন অক্ষরের যে সংখ্যাই নাও না কেন, সবক্ষেত্রেই এর উত্তর ১০৮৯ হবে। তাই বন্ধুদের কাছে খেলা দেখানোর কিছু আগে তুমি সার্ফ বা খানিকটা সাবান জলে গুলে নিয়ে সেটার সাহায্যে আঙুল দিয়ে কাচের জানালায় ১০৮৯ সংখ্যাটি লিখে রাখবে। লেখা শুকনো থাকার সময় কেউ কিছু বুঝতে পারবে না। কিন্তু তোমার বন্ধু কাচের গায়ে মুখ দিয়ে হাওয়া বের করার সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাটি চমৎকার ভাবে ফুটে উঠবে।

মানুষ কম্পিউটার

মানুষ কম্পিউটার কথাটা শুনে তোমরা খুব অবাক হয়ে যাচ্ছ, তাই না? যেমন মিছরির ছুরি অথবা চিনির বলদ বলে কিছু নেই তেমনি মানুষ কম্পিউটার বলেও কিছু নেই। তবে কম্পিউটার যেমন চোখের নিমেষে সব কাজ করে দেয়—এখানে তুমিও সেই কম্পিউটারের মতন মুহূর্তের মধ্যে বিরাট বড় বড় যোগ অংক করে ফেলতে পারবে।



ব্ল্যাকবোর্ড অথবা কাগজের পাতার উপরে তোমার একজন বন্ধুকে পাঁচঘরের যে কোনও সংখ্যা লিখতে বলো। এর ঠিক নীচে তুমিও পাঁচ-ঘরের সংখ্যা লেখ। তুমি তোমার সংখ্যা লেখার সময় খেয়াল রাখবে যে উপরের সংখ্যার সাথে সেটা যোগ করলে তার যোগফল ৯ হয়।

ধর তোমার বন্ধুর সংখ্যা— ৪৫৬২৩
তোমাকে এর নীচে লিখতে হবে— ৫৪৩৭৬

আবার তোমার বন্ধুকে ইচ্ছামতো পাঁচ ঘরের যে কোনও সংখ্যা লিখতে বলো। এর নীচে তুমিও আগের বারের মতো এমন সংখ্যা লিখবে যেন তার উপর-নীচ সংখ্যার যোগফল ৯ হয়।

তোমার বন্ধুও আবার এর নীচে পাঁচ ঘরের যে কোনও সংখ্যা লেখা শেষ হওয়া মাত্র তুমি সঙ্গে সঙ্গে এর নীচে একটা লাইন টেনে এক মুহূর্তের মধ্যে যোগফল লিখে দাও। যদি তুমি যোগফল বাঁ-দিক থেকে ডান দিকে লেখ তাহলে সবাই খুব অবাক হয়ে যাবে।

এত তাড়াতাড়ি তুমি কি করে এটা করবে বলো তো? তোমার বন্ধুর লেখা শেষ ঘরের একেবারের ডানদিকের সংখ্যা থেকে ২ বাদ দিয়ে সেটা তোমার উত্তরের ঘরের বাঁ দিকে বসাতে হবে। ধর, শেষ ঘরের সংখ্যা হ'ল ৪৮৭৬৫, তাহলে তোমায় লিখতে হবে ২৪৮৭৬৩।

ছবি বেরিয়ে এল—জলের মধ্যে থেকে

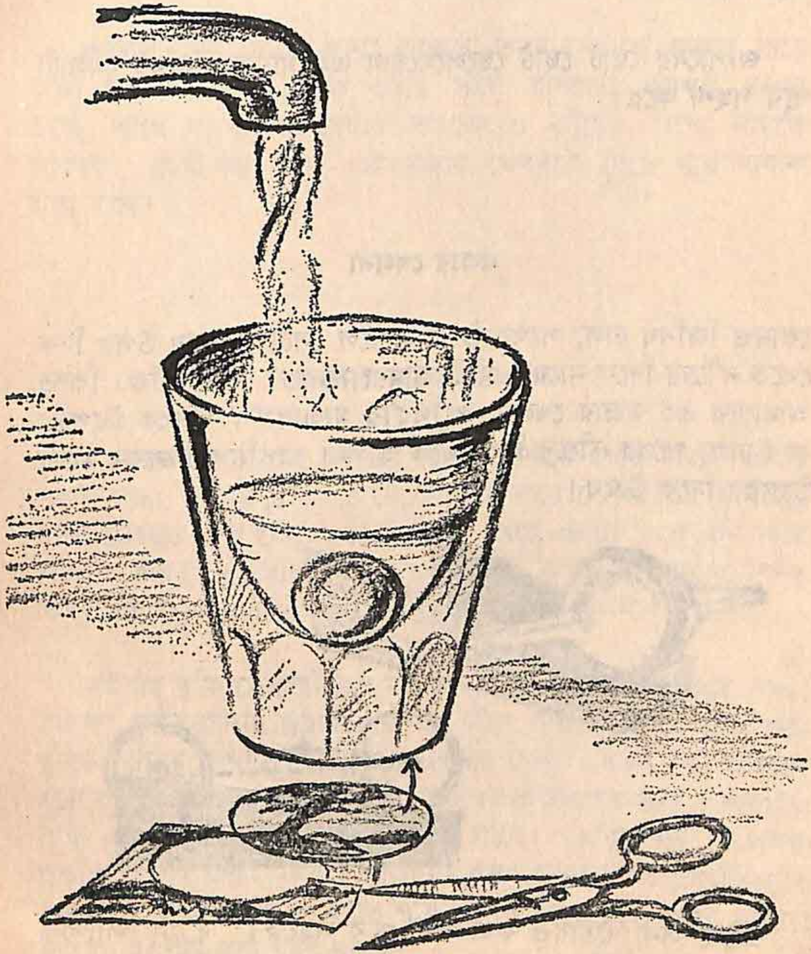
কোথাও কিছু নেই কিন্তু যদি সামান্য একটু জল ঢালতেই একটা সুন্দর ছবি ফুটে ওঠে তাহলে ভারী মজা হয়, তাই না? এই মজার ম্যাজিক ছবির খেলা দেখাতে আমাদের যন্ত্রপাতিরও বিশেষ দরকার নেই। তোমাকে জোগাড় করতে হবে শুধু একটা খুব ছোট্ট কাচ অথবা প্লাসটিকের গেলাস, একটা মার্বেল, কিছুটা কুইক-ফিক্স আর অল্প জল।

কাচ অথবা প্লাসটিকের তৈরি গেলাসের নিচের দিকটা যেন খুব সরু হয়। গেলাসের তলার অংশটুকুর সাইজ হবে একটা সিকি যতটা জায়গা দখল করে থাকে ততটুকু। গেলাসের গা-গুলিও যেন পুরু হয়। স্বচ্ছ মার্বেলটার ব্যাস হওয়া দরকার আধ ইঞ্চি থেকে ¾ ইঞ্চির মধ্যে।

এবার আমাদের ম্যাজিক আরম্ভ করা যাক্। প্রথমে গেলাসের

মধ্যে মার্বেলটা ফেলে দাও। ওটা নীচেয় পড়ে গেলাসের তলা খুব সরু বলে তার গায়ের সাথে লেগে থাকবে। এইবার কুইক-ফিক্স দিয়ে মার্বেলটাকে গেলাসের সাথে ভালো করে আটকে দাও।

গেলাসের নীচের উল্টোদিকে মাপমতো কেটে নিয়ে একটা ছোট ছবি আঠা দিয়ে আটকে দাও। ছবির সামনের অংশটা যেন গেলাসের দিকে মুখ করে থাকে যদি তুমি প্লাসটিকের গেলাস ব্যবহার করতে চাও তাহলে মার্বেল ফেলার আগে গেলাসের নীচে ছবিটা আটকে নিতে হবে। গেলাসের উপর দিক দিয়ে চাইলে তুমি ওই ছবির কিছুই দেখতে পাবে না, কেননা ছবিটা এখন মার্বেলের ফোকাল



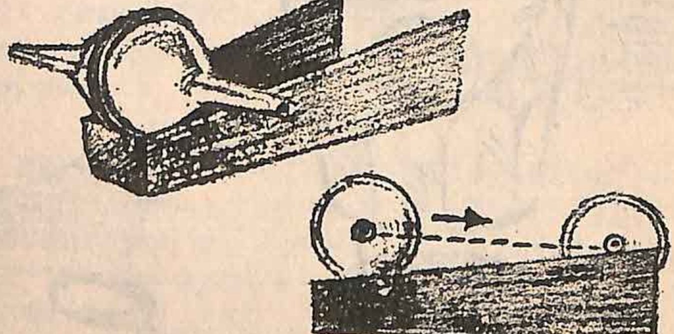
দূরত্বের অনেক বাইরে আছে। এইবার যদি তুমি কিছুটা জল গেলাসের মধ্যে ঢেলে দাও তাহলে দেখবে অবাক কান্ড, ছবিটা অনেক বড় হয়ে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে!

এর কারণ ব্যাখ্যা করাও বিশেষ কঠিন নয়। জলের প্রতিসরণ অংক বাতাসের চাইতে অনেক বেশি। সেই জন্যে জল দেওয়ার সাথে সাথে তার নীচের মার্বেলের ফোকাল দূরত্ব বদলে যায়। মার্বেলটা এখন উত্তল (convex) লেন্সের ন্যায় সহজেই ছবিটাকে ফোকাস করবে আর সঙ্গে সঙ্গে ছবিটা আমাদের চোখে ম্যাজিকের মতো ফুটে উঠবে!

জাপানের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এই ম্যাজিক ছবির খেলাটা খুব পছন্দ করে।

মজার খেলনা

কোনও জিনিষ ঢালু পথের উপর রাখলে সেটা সবসময় উপর দিক থেকে নীচের দিকে নামে—এটাই আমরা সচরাচর দেখে থাকি। কিন্তু আমাদের এই মজার খেলনা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে উপেক্ষা করে ঢালু পথের নীচের দিক থেকে আপনা আপনি ম্যাজিকের মতো উপরের দিকে উঠবে!



এই খেলনা তৈরিও করা যায় খুব সহজে। দুটো প্লাস্টিক ফানেলকে মুখোমুখি জোড়া লাগাও। তারপর জোড়া দেওয়া জায়গায়

কুইক-ফিক্স দিয়ে দাও যাতে করে ফানেল দুটো বেশ শক্ত করে আটকিয়ে যায়।

একটা ঢালু জায়গা অর্থাৎ যেখানে আমাদের খেলনা নীচ থেকে উপরে উঠবে সেটাও চাই। একটা পিচবোর্ড কেটে নিয়ে ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে ওটা তৈরি কর। ঢালু জায়গার সরু দিকের দুটো দেওয়ালের মধ্যে দূরত্ব থাকবে এক ইঞ্চি আর উল্টো দিকটা চওড়া হবে ফানেল জোড়া যতটা লম্বা ঠিক ততটা। তুমি ওটাকে ঢালু জায়গার নীচের দিকে বসালে ওটা আপনা থেকেই উপর দিকে আস্তে আস্তে চলতে শুরু করবে।

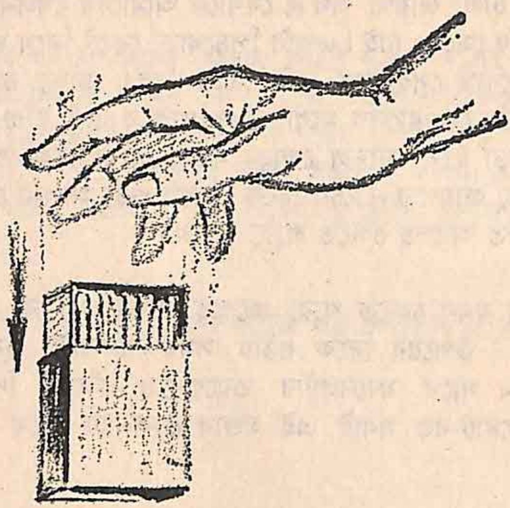
ফানেল যখন চলতে শুরু করেছে তখন সেটাকে ভালো করে লক্ষ্য কর। উপরের দিকে ওঠার সময় রাস্তাটা ক্রমশই চওড়া হচ্ছে, সাথে সাথে ফানেলটার ভরকেন্দ্রও নীচের দিকে নামতে থাকবে। ছোট-বড় সবাই এই মজাব খেলনাটা দেখে খুব অবাক হয়ে যাবে।

দেশলাই বাক্সর ভেল্‌কি

একটা দেশলাইয়ের বাক্স তোমার কোনও বন্ধুর হাতে দাও। এবার তাকে বলো, এক ফুট উপর থেকে এমন করে দেশলাইটা টেবিলের উপর ফেলতে হবে যেন সেটা পড়ে না গিয়ে একটা দিকে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। তোমার বন্ধু হয়ত চেষ্টা করবে কয়েকবার কিন্তু কিছুতেই দেশলাইটাকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারবে না।

এইবার তুমি দেশলাইয়ের বাক্সটা বন্ধুর কাছ থেকে চেয়ে নাও। তারপর কাঠি রাখার ড্রয়ারটাকে এক ইঞ্চি বাইরের দিকে বের করে ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে ফেল। যখন ওটা টেবিলে এসে ধাক্কা মারবে তখন ঐ বাক্সর ড্রয়ারের ভরবেগের জন্য দেশলাইটা পড়ে না গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এরোপ্লেন, টর্পেডো প্রভৃতিকে এই একই নিয়মে চালানো হয়। দেশলাই বাক্সর ভিল্‌কি খেলার সাথে এর পার্থক্য হচ্ছে শুধু এসব ক্ষেত্রে দ্রুত পাখা ঘুরিয়ে ভরবেগ উৎপন্ন করা হয়ে থাকে।

মাছিরও প্রত্যেক পাখার নীচে একজোড়া করে সুস্থিত অংশ (Stabilizer) থাকে। এগুলো অনেকটা রডের মতো দেখতে আর খুব ছোট্ট একটা বলের মতো ওজন এই রডের মাথায় চাপানো থাকে।



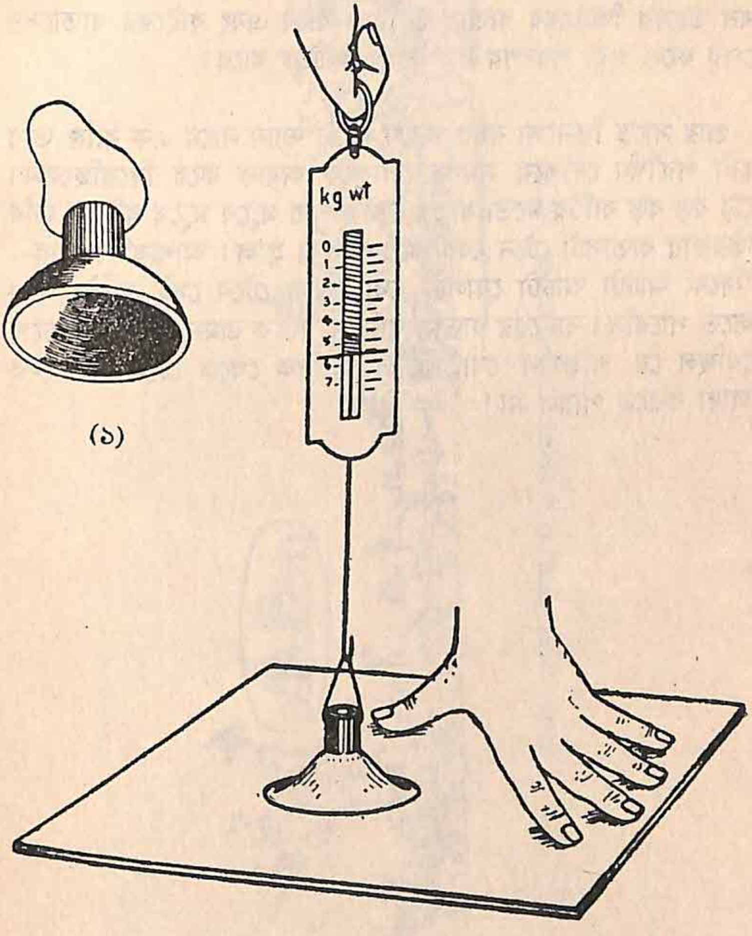
জিনিষটা যে কি অসম্ভব রকম ছোট তা বোধহয় তোমরা এবার আন্দাজ করতে পেরেছ।

মাছির দেহ থেকে এগুলি সরিয়ে নিলে দেখা যাবে সে তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে।

দুটো রবারের বাটির কাণ্ড

হাতলওয়ালা একটা রবারের বাটি কাঁচের প্লেটের উপর রেখে চাপ দিলে এক মজার কাণ্ড হয়। রবারের বাটিটা কাঁচের প্লেটের সাথে এমন জোরে আটকে যাবে যে তাকে টেনে উপরে তুলতে হলে তোমাকে বেশ কিছুটা শক্তি-প্রয়োগ করতে হবে। যদি তোমার স্প্রীং-ব্যালান্স থাকে তাহলে ঐ বাটির হাতলের সাথে একটা দড়ি অথবা তার জড়িয়ে নাও। এবার একহাত দিয়ে ঐ কাঁচের প্লেট ধরে এবং অন্য হাত স্প্রীং-ব্যালান্সে লাগিয়ে জোরে টান দিয়ে বাটিটা তোলার চেষ্টা কর।

রবারের বাটিকে তুলে আনতে তোমায় কতখানি বলপ্রয়োগ করতে হয়েছে তা স্প্রীং-ব্যালান্স থেকে জানা যাবে। এই রকম হাতল লাগানো রবারের বাটিকে অনেকে রবার-সাকারও বলে থাকেন।

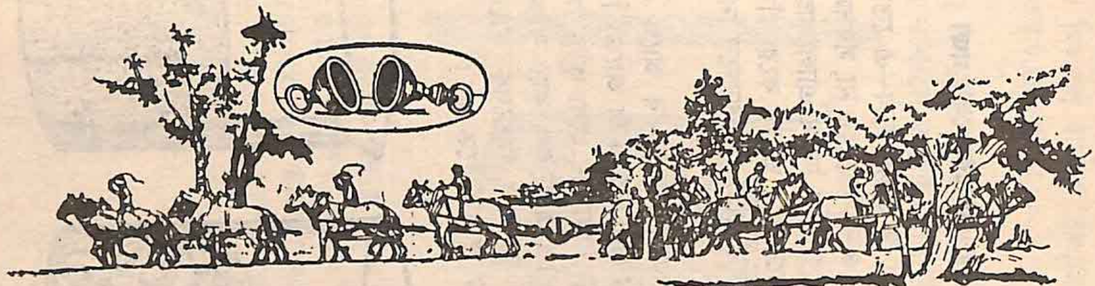


(১)

তোমার যদি এই রকম দুটো রবারের বাটি থাকে তাহলে আরও একটা মজার ভেল্‌কি দেখিয়ে তুমি সবাইকে তাক্‌ লাগিয়ে দিতে পারো। ও দুটিকে মুখোমুখি রেখে দু'হাতে খুব জোরে চাপ দাও। বাটি দুটো একেবারে আটকে যাবে। তোমরা দু'জনে দুদিক থেকে বাটির হাতল ধরে টান দাও। খুব বেশি শক্তি-প্রয়োগ করলে তবেই এদের ছাড়াতে পারবে।

কেন এমন হয় বলো তো ? তুমি রবারের বাটিকে কাঁচের প্লেটের উপর রেখে চাপ দিলে তার ভিতরের বাতাস বেরিয়ে যায় এবং বাইরের বায়ুমণ্ডলের চাপের দরুণ ওটা কাঁচের গায়ে আটকে থাকে। ঠিক সেইরকম দুটো রবারের বাটিকে তুমি যখন মুখোমুখি চেপে ধরবে, তখন তাদের ভিতরের বাতাস বেরিয়ে যাবে এবং বাইরের বাতাসের চাপের ফলে ওরা পরস্পর দৃঢ় ভাবে আটকে যাবে।

প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে অটো ভ্যান নামে এক ব্যক্তি তাঁর একটা পরীক্ষা দেখিয়ে সমস্ত লোককে অবাক করে দিয়েছিলেন। দুটো বড় বড় বাটির মতো ধাতুর তৈরি পাত্র মুখে মুখে বসিয়ে তাঁর ভিতরকার বাতাসটা টেনে বের করে নেওয়া হ'ল। আশ্চর্য ব্যাপার—দু'দিকে আটটা আটটা ষোলটা ঘোড়াতেও টেনে সেই বাটির মুখ খুলতে পারেনি। বাইরের বাতাস বাটি দু'টিকে এমন শক্ত করে চেপে রেখেছিল যে শক্তিমান ঘোড়াগুলি দু'দিক থেকে টেনেও তাদের আলাদা করতে পারল না!

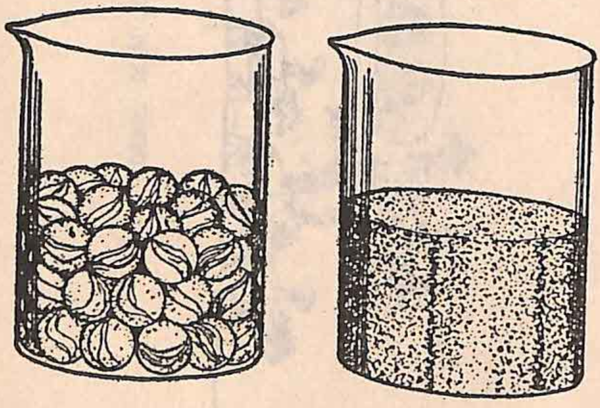


ষোলটা ঘোড়া নিয়ে অটো ভ্যানের বাতাসের চাপের পরীক্ষা।

জল আর এ্যালকোহলের মজা

কুড়ি আর কুড়ি যোগ দিলে যে চল্লিশ হবে—এ তো সকলেই জানে! এই যোগফল কখনও কমবেও না, বাড়বেও না, সবসময় একই থাকবে। কিন্তু কুড়ি সিসি জল আর কুড়ি সিসি এ্যালকোহল একটা কাঁচের নলে পুরে একসাথে মিশিয়ে খুব ভালো করে ঝাঁকালে এক অবাক করা ব্যাপার-স্যাপার ঘটে, যার ফলে অংকশাস্ত্রের নিয়মও যায় উল্টে!

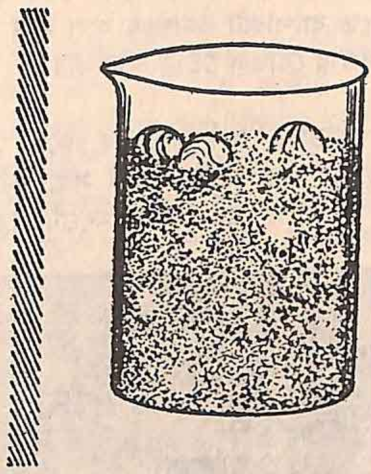
এই মজার ভেল্‌কিবাজীটা দেখানোর আগে ঐ কাঁচের নলের (যেটার গায়ে মাপ নেওয়ার জন্য দাগ কাটা আছে) ভিতর কুড়ি সিসি জল ঢাল। এরপর খুব সাবধানে ওর মধ্যে কুড়ি সিসি এ্যালকোহল ঢেলে নলের খোলামুখ ছিপি এঁটে বন্ধ করে ঝাঁকাও। তুমি অবাক হয়ে দেখবে যে, মিশ্রণের আয়তন, মিশ্রণের আগে জল ও এ্যালকোহলের যে আয়তন ছিল তার চাইতে কম।



আসলে কিন্তু ব্যাপারটা খুবই সোজা। এটা বুঝতে হলে তোমাকে একই রকম দুটো বীকার নিয়ে তার একটার অর্ধেক বালি দিয়ে ভর্তি করতে হবে। অন্য বীকারটার অর্ধেক মার্বেল দিয়ে ভর্তি কর। ধর, এখানে মার্বেলগুলি হচ্ছে এ্যালকোহলের অণু—আর বালির দানারা জলের অণু। এইবার বালি আর মার্বেলগুলো একসাথে

মিশালে দেখবে তাদের মোট আয়তন, মিশানোর আগের মার্বেল ও বালির আলাদা আলাদা আয়তনের যোগফলের চেয়ে কম। এদের দুটোকে একসাথে মিশালে বালির 'অণুরা' মার্বেল মধ্যেকার ফাঁকা জায়গাগুলির ভিতর ঢুকে পড়ে।

এখন তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ এ্যালকোহল আর জল একসাথে মিশিয়ে ঝাঁকালে তাদের মোট আয়তন কমে যায় কেন।

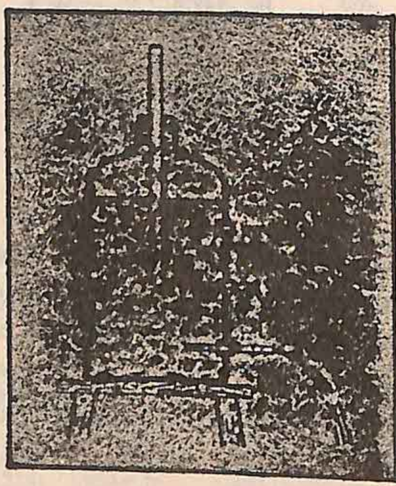


এ্যালকোহল এবং জলের অণুরা এমন ভাবে সাজানো যে তাদের মধ্যে কিছু ফাঁকা জায়গা আছে। এই জায়গাকে তুমি পকেট বলে করতেও পার। এটা অনেকটা মার্বেল মধ্যেকার ফাঁকা জায়গাটির মতন। মিশ্রণের ফলে ওই অণুরা তাই পকেটের শূন্যস্থানে এমন ভাবে লুকিয়ে পড়ে যে তাদের মোট আয়তন ম্যাজিকের মতো কমে যায়!

আশ্চর্য মজার বোতল

তুমি একটা আশ্চর্য মজার বোতল তৈরি করতে পার—যেটা থেকে অনবরত জল বেরোবে অথচ সেই জলের বেগ কখনও কমে যাবে না। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা অসম্ভব বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সত্যি সত্যি এই মজার বোতল তৈরি করা যায়।

এই আশ্চর্য বোতলে কি কি থাকবে, এসো এবার দেখি। এর খোলা মুখের ছিপির মধ্য দিয়ে একটি সরু কাঁচের নল ঢুকানো আছে। বোতলে ক, খ, গ—এই তিনটে ফুটো রয়েছে কর্কের ছিপি



দিয়ে আঁটা। 'গ' মুখটি খোলার সাথে সাথে বোতলের জল সেখান দিয়ে সমান বেগে বেরোবে যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ জল কমে কাঁচের নলের তলায় চলে না আসছে। এবার কাঁচের নলটি বোতলের আরও নীচে 'গ' মুখের কাছে নিয়ে গেলে দেখবে সেখান থেকেও সমস্ত জল সমান বেগে বেরিয়ে আসছে। ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত শোনাচ্ছে—নয় কি?

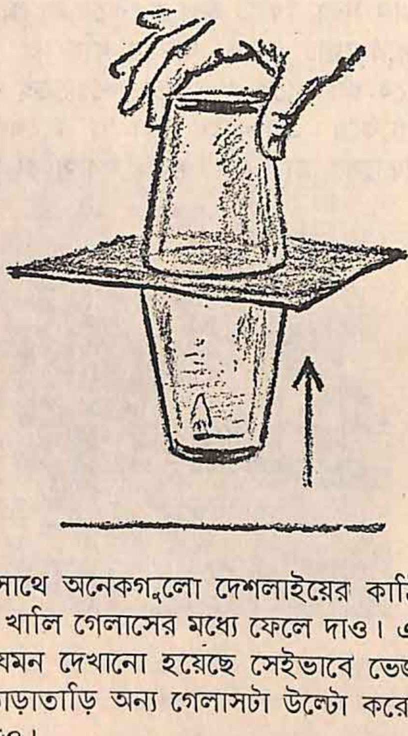
আচ্ছা এস, কি করে এটা হ'ল তা এবার ভালো করে দেখা যাক্। বোতলের 'গ' মুখ থেকে যতই জল বেরিয়ে যাবে ততই জলের উচ্চতা

কমতে থাকবে। এদিকে সরু কাঁচের নলের মধ্য দিয়ে বাতাস ঢুকে জলের উপরে বোতলের মুখের নীচে গিয়ে জমা হবে। তাহলে 'খ' মুখের উপর সম্পূর্ণ জলের স্তরটিকে ভিতরের বাতাস চাপ দিচ্ছে। বাতাসের চাপ বোতলের ভিতরে ও বাইরে একই বলে এবং 'খ গ' স্তরের চাপের জন্য এবার 'গ' মুখ দিয়ে জল বেরোতে থাকবে। আবার যেহেতু 'খ গ' স্তরের উচ্চতা সমান তাই জল 'গ' মুখ দিয়ে সমান হারে বেরিয়ে আসবে, সন্দেহ নেই।

এই বোতলের আরও দুটি মজার ভেল্কিবাজী দেখিয়ে তুমি সবাইকে অবাক করে দিতে পার। 'খ' মুখটি খুলে দিলে কি হবে বলো তো? ওখান দিয়ে কিন্তু জল বেরোবে না মোটেই, অবশ্য যদি তার ফুটোটা খুব ছোট হয়। আবার যদি 'ক' মুখ খুলে দাও তাহলে দেখবে বোতল থেকে জল তো বেরোচ্ছেই না, উপরন্তু তার ভিতরে বাতাস ঢুকছে। এর কারণ হ'ল 'ক' মুখের কাছে বাতাসের চাপ বাইরের বাতাসের চেয়ে কম। বোতলটা সত্যি সত্যি খুব মজার —নয় কি?

ম্যাজিক গেলাস

রবারের বাটির ভেল্‌কির খেলার কথা তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই। এই খেলাটাও অনেকটা ঐ রকম। এটা দেখানোর জন্য আমাদের চাই দুটো খালি গেলাস, একটা ভেজা ব্লটিং পেপার, আর একটা দেশলাইয়ের বাক্স।



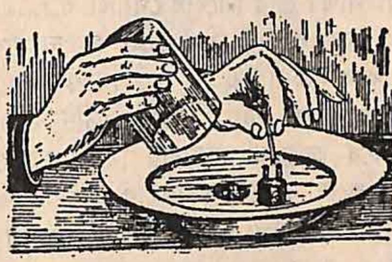
প্রথমে একসাথে অনেকগুলো দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে সে-গুলোকে একটা খালি গেলাসের মধ্যে ফেলে দাও। এবার ঐ গ্লাসের মুখে ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে ভেজা ব্লটিং পেপার বসাও। এখন তাড়াতাড়ি অন্য গেলাসটা উল্টো করে ব্লটিং পেপারের উপর বসিয়ে দাও।

জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি নীচের গেলাসের ভিতরের অক্সিজেন গ্রহণ করে সেখানে একটা শূন্যতার সৃষ্টি করবে। তুমি উপরের গেলাসে হাত দিয়ে ওটা উঠাও। দেখবে কেমন ম্যাজিকের মতো ব্লটিং পেপার আর নীচের গ্লাস তার মুখে আটকে রয়েছে!

জল উঠল—উপর দিকে !

রবিবার দিন সকাল বেলায় হাসনুবানু নানারকম মজার ভেল্‌কিবাজী দেখিয়ে বাবুন-মিঠুন, ডিংকু, লবু-কুশু ওদের সবাইকে অবাক করে দিচ্ছিল। হাসনুবানু এবার পকেট থেকে একটা দশ পয়সা বের করে সেটা একটা বড় প্লেটের উপর রাখল। তারপর ঐ প্লেটে বেশ কিছুটা জল ঢেলে পয়সাটাকে ঢেকে দিয়ে বলল—হাতের একটা আঙুলও না ভিজিয়ে তোমরা কি কেউ ঐ পয়সাটা তুলে আনতে পার ?

ছোটর দল অবাক হয়ে এ ওর মুখের দিকে চাইছে, এমন সময় ডিংকু এগিয়ে এসে বলল—"হ্যাঁ, আমি এ কাজটা করতে পারি তবে এজন্যে আমার কতকগুলো জিনিষ চাই, সেগুলো নিয়ে আমি এক্ষুনি আসছি।" এই বলে এক দৌড়ে বাড়ির ভিতর থেকে সে কয়েকটি



সাধারণ জিনিষ নিয়ে এল। এগুলি হচ্ছে—একটা কাচের গেলাস, একটা কর্ক আর একটা দেশলাইয়ের বাক্স।

ডিংকু এবার ঐ কর্কের মধ্যে কয়েকটা দেশলাইয়ের কাঠি বিঁধিয়ে সেটাকে প্লেটের জলে ভাসিয়ে দিল। তারপর ডান হাতে খালি গেলাসটাকে উল্টো করে ধরে, বাঁ-হাত দিয়ে ঐ কর্কের কাঠিগুলিকে জ্বালিয়ে দিল। এরপর কর্কে বিদ্ধ জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠিগুলোর উপরে গেলাসটাকে বসিয়ে দিতেই ওরা সবাই অবাক হয়ে দেখল প্লেটের সব জল গেলাসের মধ্যে চলে গিয়েছে।

ডিংকু দু'চার মিনিট অপেক্ষা করে, পয়সাটা আপনা থেকেই

শুকিয়ে যাবার পর, ওটাকে খুব সহজেই প্লেট থেকে তুলে নিতেই ছোটরা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

গেলাসের মধ্যে ম্যাজিকের মতো সব জল ঢুকে পড়ল কেন বলো তো? অনেক অনেক কাল আগে লোকে ভুল করে মনে করত যে, গেলাসের মধ্যেকার অক্সিজেন পুড়ে যাওয়ার ফলেই তার ভিতরের গ্যাসের আয়তন কমে যায়, তাই গেলাসের মধ্যে জল ঢুকে পড়ে। আসলে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালানোর জন্যে ভিতরের বাতাস গরম হয়ে চাপ বাড়িয়ে দেয়। খানিকটা বাতাস বেরিয়েও যেতে পারে। বাইরের চাপে তখন প্লেটের জল খুব সহজেই গেলাসের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

খেলনা পাখীর জল খাওয়া

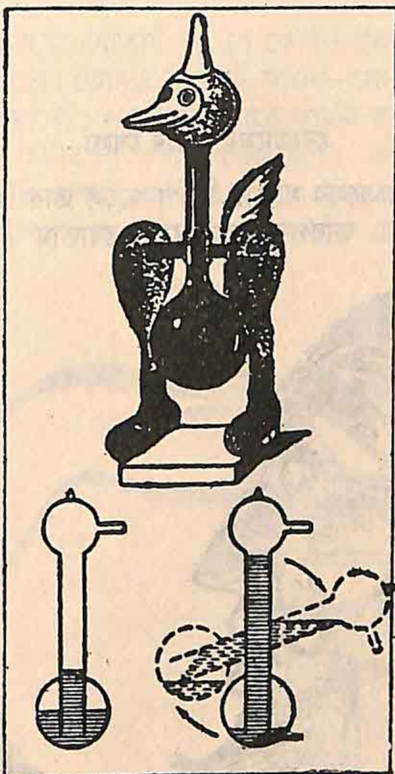
ছোট্ট একটা খেলনা-পাখী তার নিজের খেয়াল খুশীমতো ঠোঁট ডুবিয়ে জল খাচ্ছে, আবার জল খাওয়া শেষ হলে আপনা থেকেই মুখ তুলে নিচ্ছে—ব্যাপারটা খুব মজার নয় কি? কোথাও কিছু নেই, অথচ এই খেলনা-পাখী বারে বারে তার নিজের ঠোঁট জলে দেবে, আবার মুখটাকে তুলে নিয়ে আগের অবস্থায় ফিরে আসবে। এই প্রক্রিয়া অনবরত চলতে থাকলে বাস্তবিক অবাক হবারই কথা।

এই খেলনা-পাখীর মাথা হচ্ছে একটা কাঁচের গোলক, দেহটা কাঁচের নলে তৈরি। আর নলের এই খোলা মুখটা ঢুকানো রয়েছে নীচের বড় একটা কাঁচের গেলাসের ভিতর।

ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, সেইভাবে তুলো দিয়ে তোমরা এই খেলনা-পাখীর ঠোঁট, চোখ ও মাথার টুপি তৈরি করতে পারো। কাঁচের জিনিষ তৈরি করে এমন কারখানায় গিয়ে বললে তারা সহজেই তোমাদের এই রকম একটা পাখী বানিয়ে দেবে। খুব পাতলা প্লাইউড কেটে তার থেকে খেলনা-পাখীকে ধরে রাখবার জন্য দুটো দেওয়াল তৈরি কর। এর তলায় একটা কাঠের পাটাতনও থাকবে।

কেন এই পাখী বারে বারে জলে তার ঠোঁট ডুবায় ও তুলে নেয়, এবার তা বলছি। খেলনা-পাখীর নীচের বড় গোলকটা কাঁচ-নলের খোলা মুখের কিছুটা উপর পর্যন্ত ইথার দিয়ে ভর্তি করা হয়েছে।

যেহেতু নীচের এই গোলক উপরটার চেয়ে ভারী তাই পাখীটা কিছু-ক্ষণের জন্যে খাড়া অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে। এরপর ঐ ইথার কাঁচের নল দিয়ে আস্তে আস্তে উপরের ছোট গোলকের দিকে উঠে আসে। সেই সঙ্গে পাখীর মাথাটাও ক্রমশ নীচু হয়ে জলের মধ্যে ঠোঁট ডুবিয়ে দেয়। এটা করার সময় ওর মাথার তুলোটাও যায় ভিজে।



পাখীটা অনুভূমিক অবস্থায় চলে এলে কাঁচ-নলের নীচের খোলা মুখটা বড় গোলকের ইথারের উপরের অংশ থেকে খানিকটা উঁচুতে উঠে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে কাঁচ-নলের ইথার নীচের বড় গোলকে চলে আসবে, আর সেই সাথে আমাদের খেলনা-পাখীও খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। অর্থাৎ ইথারের উপর-নীচ করার ফলেই পাখীর মুখ জলের দিকে এগিয়ে যায় ও সরে আসে।

কিন্তু কেন ইথার ম্যাজিকের মতো একবার উপরে ওঠে, আর একবার নীচে নামে বলতে পার ? ইথার সাধারণ উষ্ণতায় খুব সহজেই

বাষ্পীভূত হয়। ইথার বাষ্পের এই চাপ তাপমাত্রার সঙ্গে খুব সহজেই বদলে যায়। খেলনা-পাখীর মাথার গোলকের তাপমাত্রা নীচের বড় গোলকের তাপমাত্রার চাইতে কম থাকে। আবার কাঁচ-নলের সম্পৃক্ত বাষ্পের চাপ কমে যাওয়ার জন্য ইথারের উপরে ওঠা ছাড়া আর অন্য কোনও পথ খোলা থাকে না। পাখীর মুখ এই জন্যেই উপর-নীচ করতে পারে।

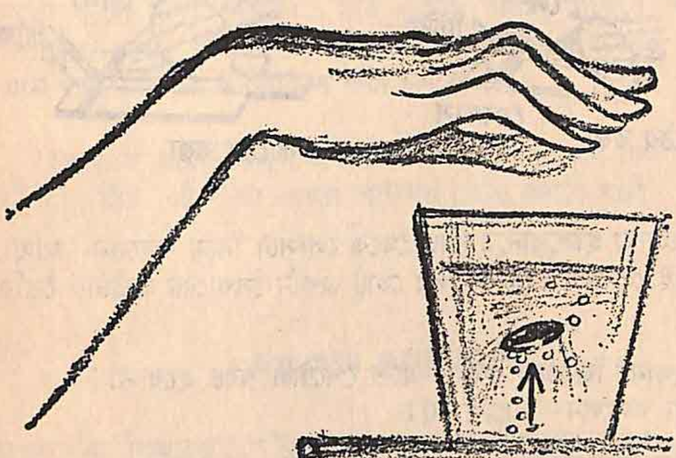
বোতামের মজার খেলা

একটা সোডার বোতলের মুখের ছিপি খুলে তার জল একটা গেলা-সের ভিতর ঢাল। তারপর একটা ছোট্ট বোতাম ঐ সোডার জলের



মধ্যে ছেড়ে দাও। বোতামটা প্রথমে ডুবে যাবে। কয়েক মুহূর্ত পরে তুমি গেলাসের কিছু উপরে হাত রেখে বোতামটাকে উপরে আসতে বলো। দেখবে অবাক কান্ড, বোতামটা আস্তে আস্তে গেলাসের উপরের দিকে উঠে আসছে। খানিক বাদে যদি তুমি বোতামটাকে ডুবে যেতে বলো, তখন সেটা আবার জলের নীচে ডুবতে শুরু করে দেবে। ব্যাপারটা খুব মজার—নয় কি ?

এই খেলাটা শুধু বোতাম নয়, যে কোনও হাল্‌কা জিনিষ দিয়ে দেখানো যেতে পারে। তোমরা নিশ্চয়ই জানো—সোডার জলের ভিতর সোডা থাকে না মোটেই; ওর ভিতর থাকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস। যখন বোতামটা গেলাসের নীচে থাকে তখন কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের ছোট ছোট বুদ্বুদ ওটার চারপাশে জমতে শুরু করে। এই রকম অনেক বুদ্বুদ জমা হয়ে বোতামটাকে ঠেলে ভাসিয়ে দেয়



উপরে। উপরে এসে যখন বুদ্বুদগুলো ফেটে যায় তখন বোতামটা আবার ডুবতে শুরু করবে। যতক্ষণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের বুদ্বুদ বেরুতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত বোতামটা উপর-নীচ করবে।

গেলাসের উপর হাত তুলে বোতামকে নির্দেশ দিতে হলে আগে থাকতে তোমায় দেখে নেওয়া দরকার—বোতামের নীচে থেকে উপরে উঠে আসতে অথবা উপর থেকে নীচে নামতে কতক্ষণ সময় লাগছে।

লেন্স দিয়ে লাইটার তৈরি

রবিবার দিন সকালবেলা হাসুবানু একটা লেন্স দিয়ে সূর্যকিরণ ফোকাস করে কতকগুলি কাগজে আগুন ধরাচ্ছিল। আর তাই দেখে চন্দ্রভানু, তুতুল, সোমনাথ সবাই খুব মজা করছিল। এমন সময় বাড়িতে এসে ঢুকলেন ছোটমামা। ছোটমামা হেসে বললেন—কি করছ তোমরা? রবিবার বলে কি পড়াশুনা একেবারে বন্ধ?

হাসুবানু তার লেন্সটা মামাকে দেখিয়ে বলল—মামা, আমি এতক্ষণ এই লেন্সটা দিয়ে কাগজে আগুন ধরাচ্ছিলাম।





ছোটমামা হাসুবানুর কাছ থেকে লেন্সটা নিয়ে বললেন—আচ্ছা, আমি এই লেন্সটা দিয়ে সুন্দর ছোট্ট একটা সিগারেট লাইটার তৈরি করব।

চন্দ্রভানু জিজ্ঞেস করল—এতে পেট্রোল খরচ হবে না?
মামা বললেন—মোটেই না।

তুতুল জিজ্ঞেস করল—চাপ দেওয়ার জন্য লিভার থাকবে এতে?
মামা বললেন—লিভারের প্রয়োজন নেই এখানে। এই লাইটার তৈরি করতে চাই শুধুমাত্র পরিষ্কার আকাশ আর সূর্যকিরণ। অবশ্য তোমার লেন্সটা খুব দরকার।

ছোটমামা কতকগুলি প্রয়োজনীয় জিনিস বাড়ির ভেতর থেকে নিয়ে এসে বাইরে একটা টুলের উপর রাখলেন। এগুলি হল—(ক) একটা পুরু কাঠের তক্তা, (খ) খুব ছোট স্প্রীংয়ের তার, (গ)

ধাতুর তৈরি একটা টিউব, (ঘ) লেন্সকে ধরে রাখবার জন্য কিছুটা মোটা তার, (ঙ) লেন্স।

এরপর তিনি কাঠের তক্তার একপাশে মোটা তারের সাহায্যে লেন্সটাকে আটকালেন। যেখানে সূর্যকিরণ ফোকাস হচ্ছে সেখানে ছোট স্প্রীংয়ের তারটা লাগালেন। তার ঠিক ওপরেই রাখলেন তিনি সিগারেট টিউব।

হাসুবানু জিজ্ঞাসা করল—মামা, স্প্রীংটা গরমে লাল হয়ে উঠছে কেন ?

মামা বললেন—লেন্সের ভিতর দিয়ে সূর্যকিরণ এসে স্প্রীংয়ের উপর ফোকাস করছে বলে।

এরপর তিনি পেন্সিল দিয়ে কাগজের উপর আর এক রকম সিগারেট লাইটারের মডেল আঁকলেন। এর কাঠের উপর ভাগের দুটি অংশ। একটা হচ্ছে—লেন্স, ঠিক স্লাইড রুলের মতো, যেটাকে ইচ্ছা-মতো খুলে রাখা চলবে। আর একটা অংশে থাকবে—স্প্রীং ও সিগারেট রাখার টিউব। লেন্সটাকে খুশি মতো এগিয়ে ও পিছিয়ে এনে স্প্রীংয়ের উপর ফোকাস করা চলবে।

চন্দ্রভানু মামার কাছ থেকে এই ছবিটা নিয়ে রেখে দিল, সামনের রবিবার ঠিক এই রকম একটা লাইটার তৈরি করবে বলে।

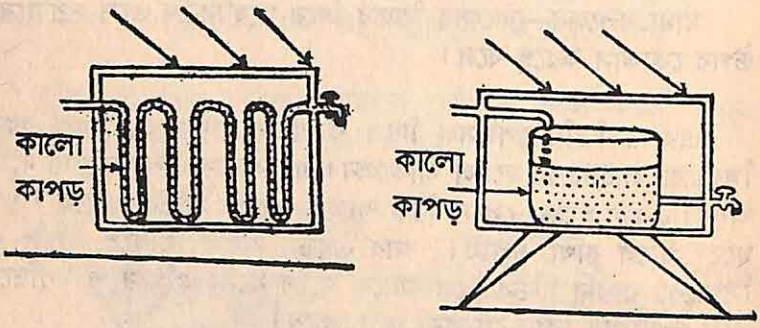
জল গরম করার কায়দা

হাসুবানু কিছুতেই শীতকালে ঠান্ডা জলে স্নান করতে চায় না। আর শীতে ঠান্ডা জলে স্নান করতে সত্যিই খুব কষ্ট হয়—তাই না ? হাসুবানুর মামা তাকে বললেন—'তোমার জন্যে আমি গরম জল তৈরি করে দেব, তুমি তাতেই স্নান করবে।'

শুনে হাসুবানু তো মহাখুশী। সে বসে বসে দেখতে লাগল তার মামা কি করে গরম জল তৈরি করেন। কিন্তু একি ব্যাপার ! মামা তো উনুন ধরিয়ে জল গরম করলেন না ! তার বদলে তিনি একটা ধাতুর তৈরী পাত্রে কিছুটা জল নিয়ে পাত্রটিকে কালো কাপড় দিয়ে

বেশ ভাল করে মুড়ে নিলেন। তারপর ঐ পাত্রটিকে একটা কাচের বাক্সের মধ্যে পুরে ঘণ্টা খানেক রোদে রাখলেন। জলে হাত দিয়ে হাসুবানু আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল—'কি আশ্চর্য, জল তো বেশ গরম হয়ে উঠেছে। আমি এক্ষুনি চান করে নিচ্ছি।'

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর হাসুবানু, চন্দ্রভানু, তুতুল সবাই মিলে মামাকে জিজ্ঞেস করল—'আচ্ছা, কি করে জলটা গরম হয়ে উঠল ?'



মামা বললেন—'তোমরা সবাই জান যে, সূর্যকিরণ সাধারণ কাচের মধ্যে ঢুকতে পারে কিন্তু একটা বদ্ধ কাচের ঘরের মধ্যে সূর্যকিরণ ঢুকে যদি কোনও পাত্রে আঘাত করে তবে তার বেশির ভাগ রশ্মির দৈর্ঘ্য বেড়ে যায়। এই নতুন দীর্ঘ রশ্মিগুলি আর পুনরায় তাপ-বিকীরণ করতে পারে না ও কাচের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসতেও পারে না। এইভাবে কাচের মধ্যের উত্তাপ ক্রমশ বাড়তে থাকে।'

তুতুল জিজ্ঞাসা করল—'কালো কাপড় দিয়ে মুড়ে নিলে কেন মামা ?'

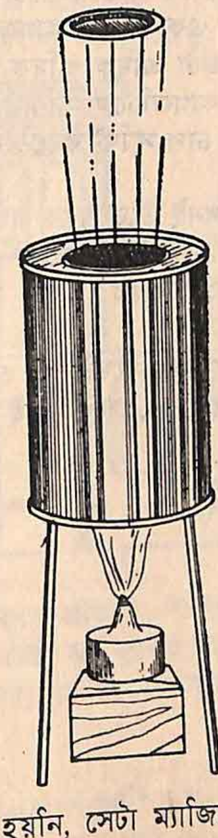
মামা বললেন—'কালো কাপড় সূর্যকিরণ শুষে নিয়ে বেশী উত্তাপের সৃষ্টি করে—এবং তখন ঐ উত্তপ্ত রশ্মিগুলি আর কাচের বাইরে বেরিয়ে আসতে না পারায় পাত্রের জল গরম হতে থাকে।'

পরদিন সকালে মামা বাড়ির কলের মুখে একটা রবারের নল লাগালেন। এরপর নলের একদিন কতকগুলি অ্যালুমিনিয়মের ইউ টিউবের সঙ্গে জুড়ে দিলেন। তারপর ইউ টিউবগুলি যথা-

রীতি কালো কাপড় দিয়ে মুড়ে একটা কাচের বাক্সের মধ্যে পুরে রোদ্দুরে রাখলেন এবং তার মুখের অন্যদিকে লাগালেন একটা কল। হাসুবানু কলের মুখ খুলতেই গরম জল পড়তে আরম্ভ করল। ওরা সবাই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

টিনের কৌটোর ভেল্‌কি

ছোট্ট একটা টিনের কৌটোর ঢাকনি খুব শক্ত ভাবে কৌটোর সঙ্গে না লাগিয়ে গরম করলে ভারী এক মজার কাণ্ড হবে। খানিক বাদে সবাই অবাক হয়ে দেখতে পাবে, টিনের কৌটোর ঢাকনিটা, যেটায়



মোটেই হাত দেওয়া হয়নি, সেটা ম্যাজিকের মতো কৌটো থেকে উড়ে বেরিয়ে গেল! কৌটোকে গরম করার জন্য তুমি ছবিতে যেমন

দেখানো হয়েছে, ঠিক সেইভাবে স্পিরিট ল্যাম্প ব্যবহার করতে পার। একটা লোহার তিনপায়া স্ট্যান্ডের উপর কৌটোটি রাখতে হবে। দরকার মনে হলে স্পিরিট ল্যাম্পকে একটা কাঠের ব্লকের উপর রেখেও কৌটোকে গরম করা যেতে পারে। এসব না থাকলে সাধারণ স্টোভ ব্যবহার করলেও চলবে।

কেন এমন হয় বলো তো ? তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, বাতাস সব জায়গাতেই আছে, এমন কী ঐ ছোট্ট কৌটোর মধ্যেও কিছুটা বাতাস আছে। কৌটো গরম হলে তার ভিতরের বাতাসও গরম হবে। আর বাতাস খুব বেশী গরম হলে তার চাপ বেড়ে যায়। তাপমাত্রা যত বেশী হবে, বাতাসের অণুর গতিবেগ হবে তত বেশী। এখন এই আবদ্ধ কৌটোর ভিতরের দেওয়ালে আঘাত করার সময় এই গরম বাতাসের অণুরা বেশী চাপ প্রয়োগ করে। কী করে এটা হয় তা বুঝতে হলে তুমি একটা পুরু কাগজ হাতে নিয়ে তার উপর কিছু বালি ছোঁড়। কাগজটা এদিক ওদিক নড়বে। বালুকণাগুলি যদি এইভাবে অনবরত কাগজটিকে আঘাত করতে পারত তাহলে তারা তার উপর অনবরত চাপ সৃষ্টি করতেও পারত।

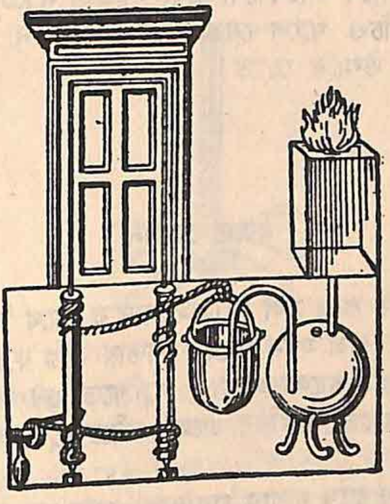
কৌটোর ঢাকনিটা তখনই উড়ে যাবে, যখন তার নীচে বাতাসের অণুর আঘাত যে বল ঢাকনিটাকে টিনের কৌটোর সঙ্গে আটকে রেখেছিল তার চইাতে বেশী হবে।

শুধু মাত্র কৌটোটি গরম করতেই কী ভাবে ভোজবাজীর মতো তার ঢাকনিটা উড়ে বেরিয়ে গেল, দেখে সবাই খুব অবাক হয়ে যাবে।

মন্দিরের দরজা খোলার মন্ত্র

অনেক অনেকদিন আগেকার কথা। মিশর দেশের মন্দিরের পুরোহিতেরা ভক্তদের এমন সব অলৌকিক কান্ডকারখানা দেখাতেন যে সবাই খুব অবাক হয়ে যেত। ভক্তের দল ভাবত, পুরোহিতেরা স্বয়ং ঈশ্বরের প্রেরিত দূত।

মিশরের এই সমস্ত পুরোহিত ভক্তদের কাছে বলতেন—"ঈশ্বর আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা ধূপধুনো জ্বেলে পুজো আরম্ভ করলে তিনি তাঁর অলৌকিক শক্তির সাহায্যে মন্দিরের দরজা খুলে দেবেন। আর অবাক কান্ড, সত্যি সত্যি ওঁরা যখন বেদীর



উপর ধূপধুনো জ্বালিয়ে প্রার্থনা আরম্ভ করতেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের বিরাট দরজা ম্যাজিকের মতো আপনা আপনি খুলে যেত। আর সন্দেহ নেই, সাধারণ লোকেরা এই ব্যাপার দেখে খুব অবাক হয়ে যেত।

আসলে কিন্তু এইসব পুরোহিতরা যা দেখাতেন তা মোটেই অলৌকিক নয়। এর পিছনের মূল ভূমিকা ছিল রসায়নশাস্ত্রের।

পুরোহিতদের অনেকেই খুব ভালো বিজ্ঞান জানতেন। কেউ কেউ পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, অংকশাস্ত্র এবং রসায়নবিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বিজ্ঞানের নানারকম ভেলকিবাজী সুকৌশল দেখিয়ে এঁরা সবাইকে অবাক করে দিতেন। সাধারণ লোকে এত সব বুঝতো না। তারা ব্যাপারগুলোকে ঈশ্বরের অসীম করুণা ও আশীর্বাদ বলে মেনে নিত।

কেমন করে মন্দিরের অত বড় বিরাট দরজা আপনা থেকেই খুলে যেত এবার তা বলছি। মন্দিরের দরজার সামনে ধাতুর একটা ফাঁপা বেদী ছিল। এর নীচের অংশটা ফাঁপা। ধূপধুনো জ্বালিয়ে পূজো আরম্ভ করলে ঐ বেদীর নীচের বাতাস গরম হয়ে মেঝের নীচে লুকিয়ে রাখা একটা জলের পাত্রের উপর খুব বেশী করে চাপ দিত। সঙ্গে সঙ্গে ঐ পাত্র থেকে জল বেরিয়ে আর একটা খোলা বালতির ভিতর গিয়ে পড়ত। ঐ বালতিটা ভারী হয়ে নীচেয় নামতো, সেই সঙ্গে বালতির সাথে আটকানো এবং দরজার নীচের কাঠে জড়ানো একটা দড়ির প্যাঁচও খুলে যেত। আর অমনি মন্দিরের দরজা সাধারণের জন্যে উন্মুক্ত হোত!

মজার মেসিন

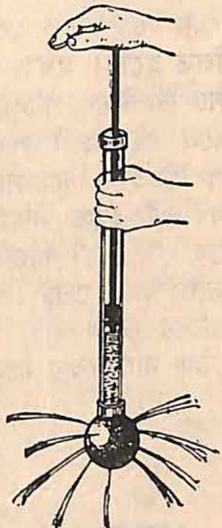
ফুল গাছে ঝাঁঝরি করে জল দিচ্ছিল দাদুর সাথে ডিংকু। ঝাঁঝরি থেকে ঝর্ণার মতো জল যখন গাছের পাতায় আর ফুলের উপর পড়ে, তখন ডিংকুর ভারী ভালো লাগে। খুশিতে ওর মনটা নেচে ওঠে, ইচ্ছে করেই তখন সে ঝাঁঝরির জলের নীচে দু'হাত পেতে দেয়।

বাগানের কাজ হয়ে যাবার পর দাদু এমন সব মজার কাণ্ডকারখানা করেন, যা দেখে ছোটর দল, মানে ডিংকু বাপ্পা বাবুন-মিঠুন হাসুবানু মৌ সবাই খুব অবাক হয়ে যায়।

আজকে দাদু কোথা থেকে একটা পুরানো সাইকেলের পাম্পার জোগাড় করে এনেছেন। পাম্পারের সামনের মুখটা খুলে সেখানে তিনি লাগিয়েছেন চারপাশে ফুটো করা একটা রবারের গোলক। পাম্পারের ভিতর পিস্টন ঢোকাবার আগে তার মধ্যে কিছু জল ঢালা

হ'ল। এবার পিস্টনটি ঢুকিয়ে তাতে চাপ দিলেন তিনি। ওরা সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল রবারের গোলকের সর্বদিকের ফুটো দিয়েই জল সর্বত্র সমান ভাবে বেরুচ্ছে।

মজাটা দেখিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিমান নাতি-নাতনীরা প্রবল উৎসাহে জল নিয়ে খেলা করবার জন্যে তাদের পুরানো রবারের বল জোগাড় করে আনল। বলের চারপাশে ছোট ফুটো করে তার মধ্যে জল পুরে চাপ দিতেই দেখা গেল সেই জল সবগুলো ফুটো দিয়ে সমান ভাবে বেরুচ্ছে।



দাদু এবার তাঁর কোটের পকেট থেকে ছোট্ট একটা জিনিষ বার করলেন। ছোটরা এই বস্তুটা আগে কখনও দেখেনি। তাই ওরা সবাই ঝুঁকে পড়ল ওটা দেখার জন্যে। জিনিষটা কাঁচের তৈরি, পাশাপাশি দুটো টিউব, একটা ছোট অন্যটা বড়। দুটো টিউবকেই নীচের দিকের সরু একটা নল সংযুক্ত করে রেখেছে। দাদু কোটের অন্য আর একটা পকেট থেকে দুটো টিউবেরই গায়ে গায়ে ফিট করে এমন দুটো কাঠের পিস্টন বার করলেন। এবার টিউব দুটো এবং সংযোজক নলটি জল দিয়ে ভর্তি করা হ'ল। সবশেষে বড় পিস্টনের মাথায় একশো গ্রাম ওজন দিয়ে দাদু বললেন—"এই একশো গ্রাম ওজনকে কী করে আরও উঁচুতে, মানে টিউবের মাথা থেকে উপরে তুলবো বলো তো?"

ওদের মধ্যে হাসনুবানুই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী চালাক, সে অমনি জিজ্ঞেস করে বসল—"বড় পিস্টনের তলের ক্ষেত্রফল কত ?" দাদু বললেন—"বড় পিস্টনের তলের ক্ষেত্রফল দশ বর্গ সেণ্টিমিটার এবং ছোট পিস্টনের তলের ক্ষেত্রফল দুই বর্গ সেণ্টিমিটার। হাসনুবানু মনে মনে আঁক কষে উত্তর দিল—"ছোট পিস্টনের মাথায় মাত্র কুড়ি গ্রাম ওজন চাপালে ওই একশো গ্রাম ওজনকে সহজেই বড় টিউবের মাথার উপরে তোলা যাবে।"

ওরা সবাই অবাক হয়ে ম্যাজিকের মতো এই ভোজবাজীটা কেমন করে সম্ভব হচ্ছে তা জানতে চাইল। দাদু ওদের বুঝিয়ে দিলেন —ছোট পিস্টনে কুড়ি গ্রাম ওজন চাপালে সেই চাপ সমানভাবে জলের মধ্যে দিয়ে সঞ্চালিত হচ্ছে। অর্থাৎ এই চাপ বড় পিস্টনকে, যার তলের ক্ষেত্রফল ছোট পিস্টনের পাঁচগুণ—তাকে উপরের দিকে ঠেলে তুলবে। ইচ্ছা করলে এই বড় পিস্টনের মাথায় দুই কিলোগ্রাম ওজন রেখে ছোট পিস্টনে হাত দিয়ে সামান্য একটু ঠেলা দিলেই ওটা উপরে উঠে আসবে। এটা হচ্ছে একটা হাইড্রোলিক মেশিনের মডেল। এর সাহায্যে খুব বড় ভারী গাড়ী, কারখানার পার্ট, তুলো ইত্যাদি খুব সহজেই তোলা যায়। ছোট পিস্টনের মাথায় কতো কম ওজন চাপিয়ে বড় পিস্টনের উপর রাখা কতো বেশী ভারী মাল তোলা যায়। ব্যাপারটা ঠিক ম্যাজিকের মতো—নয় কি ?

চুম্বকের খেলা

সুকুমার রায়ের হ-য-ব-র-ল বইতে একটা রুমাল হয়ে গিয়েছিল আস্ত একটা বিড়াল। সেই রকম একটুকরো লোহাকে চুম্বক দিয়ে বেশ কয়েকবার ঘষলে যদি সেটাও চুম্বক হয়ে যায় তাতে আর বিচিত্র কি !

এই ছোট্ট চুম্বক দিয়ে যে কত রকম মজার ভেলকিবাজী দেখানো যায়—তা বলে শেষ করা যাবে না। চুম্বকের ধর্ম হ'ল লোহাকে আকর্ষণ করা। এই আকর্ষণ-শক্তি চুম্বকের দু'দিকে অর্থাৎ উত্তর আর দক্ষিণ মেরুতে সব চাইতে বেশি। তোমাকে যদি কেউ খানিকটা গন্ধক আর লোহার গুঁড়ো একসাথে মিশিয়ে আলাদা করতে

বলে তাহলে তুমি কি করবে বলো তো? তুমি একখণ্ড চুম্বক এনে ঐ মিশ্রণের উপর ধর। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিকের মতো লোহার গুঁড়োগুলো উঠে এসে তোমার চুম্বকের গায়ে আটকে যাবে। খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবে ঐ লোহার গুঁড়ো চুম্বকের দুই প্রান্তে অর্থাৎ উত্তর আর দক্ষিণ মেরুতে যেখানে আকর্ষণ বল সবচেয়ে বেশি, তার ধারে-কাছেই লেগে রয়েছে—মাঝখানে নয়।

দু'খণ্ড চুম্বক কাছাকাছি আনলে একটার উত্তর মেরু অন্যটার দক্ষিণ মেরুকে আকর্ষণ করে ধরে রাখবে।

আজকে তোমাদের একটা চুম্বকের ছোট্ট ভেল্‌কিবাজী শিখিয়ে দিচ্ছি—যেটা দেখিয়ে তুমি সবাইকে একেবারে অবাক করে দিতে পারো।

শোলা অথবা খুব নরম কাঠ দিয়ে ছোট্ট একটা নৌকা তৈরি কর। এবার একটা লোহার পেরেককে একখণ্ড চুম্বকের যে কোনও একপ্রান্তের মেরু দিয়ে একই দিকে টেনে বেশ ভালো করে ঘষো। চুম্বক দিয়ে বেশ কয়েকবার ঘষবার পর দেখবে অবাক কাণ্ড, লোহার পেরেকটাও চুম্বক হয়ে গিয়েছে। একটা ছোট্ট আলপিন এনে ঐ পেরেকটার একপ্রান্তে ধর। চুম্বকের মতো ঐ পেরেকটাও কিন্তু এবার আলপিনটাকে টেনে ধরে রাখবে।

এবার তোমার শোলার নৌকার পাটাতনের নীচে ঐ পেরেকটাকে আটকে দাও। একটা প্লাস্টিকের গামলা অথবা এলুমিনিয়ামের পাত্রে জল ভর্তি করে নৌকাটিকে ভাসাও। এখন চুম্বকটাকে এগিয়ে অথবা পিছিয়ে এনে তুমি ইচ্ছামতো নৌকাকে তোমার যেদিকে খুশী নিয়ে যেতে পারবে।

একখণ্ড চুম্বক দিয়ে লোহাকে ঘষে যে চুম্বক তৈরি হয় সেটা অবশ্য খুব শক্তিশালী হয় না। শক্তিশালী চুম্বক তৈরি করতে হলে বিদ্যুৎ প্রবাহের দরকার হয়। একখণ্ড লোহার উপরে কয়েক প্যাঁচ তার জড়িয়ে নিয়ে যদি সেটার ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ পাঠান যায় তাহলে ঐ লোহার খণ্ড চুম্বকে পরিণত হবে। কিন্তু মজা এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলবে, শুধুমাত্র ততক্ষণই ওটা চুম্বক থাকবে। বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ হলে ওটা আর চুম্বক থাকে না। এই চুম্বকের নাম তড়িৎ-চুম্বক।

এই তড়িৎ-চুম্বক ম্যাজিকের মতো এমন সব কাজ করে যে দেখলে

সত্যিই অবাক হয়ে যেতে হয়। কারখানার বিরাট বিরাট লোহার পাতের স্তূপ, পেরেকের ড্রাম, তার ইত্যাদি এই তড়িৎ-চুম্বকের ক্রেনে করে খুব সহজেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়।

—

নিজের চোখকে আমরা সকলেই দারুণ বিশ্বাস করি; এত বিশ্বাস করি যে, নিজের চোখে কোনও কিছু ঘটতে দেখলে আমরা তা কখনই অসত্য বলে মনে করতে পারি না। অথচ, চোখেরও, দেখা যায়, কখনও কখনও বেশ বিভ্রম ঘটে। অনেক অসত্য জিনিস তখন চোখের দৃষ্টিতে হুবহু সত্য বলে প্রতীয়মান হয়। ইংরেজীতে একে বলে 'অপ্‌টিক্যাল ইলিউশন'; বাংলায়—'চোখের ধাঁধা'। এমন কয়েকটি চোখের ধাঁধার মজার ছবি এঁকে দেখিয়েছেন পার্থ-সারথিবাবু এ বইয়ে। মজাগুলি নিজে করে দেখলেও যেমন ছোটরা আশ্চর্য হবে, অন্যকে করে দেখালে তারাও তেমনি অবাক হয়ে যাবে॥

মোট চল্লিশটি হতবুদ্ধিকর মজার ব্যাপার এ বইয়ে আছে। তার সবগুলোই অবশ্য চোখের ধাঁধা নয়; কিছু আছে বুদ্ধির খেলা, কয়েকটি অঙ্কের ম্যাজিক, এবং বেশ গুটি কয় বৈজ্ঞানিক মজা। হাতের কাছেই পাওয়া যায় এমন সামান্য কিছু টুকিটাকি জিনিস হলেই এগুলি করে দেখা যায়—সঙ্গে সঙ্গে দেখানোও যায়। ছোট বড় সকলেই এগুলি দেখে যতখানি বিস্মিত বোধ করবে, ঠিক ততখানিই আনন্দও পাবে॥